শ্রীপান্থ
যখন ছাপাখানা এলো

যখন
ছাপাখানা
এলো
শ্রীপান্থ

যখন ছাপাখানা এলো

শ্রীপান্থ

চার্লস উইলকিনস এবং পঞ্চানন
কর্মকার থেকে শুরু করে গত দু'শ বছর
ধরে যে-সব দেশী-বিদেশী জ্ঞানী-গুণী
শিল্পী এবং কারিগর বাংলা মুদ্রণ এবং
প্রকাশন শিল্পকে নানাভাবে সামনের
দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁদের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে।

এই রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। পাঠকদের আগ্রহ আর উৎসাহে শেষ পর্যন্ত বই হিসাবে প্রকাশ করতে হল। স্বভাবতই এ-ব্যাপারে আমার কিছুটা সংকোচ ছিল। বলতে দ্বিধা নেই, পরিশিষ্টে প্রাসঙ্গিক নানা তথ্য সংযোজনের পরও তা রয়েই গেল। এক কারণ, যথার্থ গবেষক বলতে যা বোঝায় আমি ঠিক তা নই। দ্বিতীয়ত, এ-বিষয়ে আমার যোগ্যতাও সীমাবদ্ধ। তবু যে শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধে সাড়া না-দিয়ে পারা গেল না তার পিছনে কারণ একটাই,—যদিও মুদ্রিত বাংলা-বইয়ের বয়স হল প্রায় দু'শ বছর তবু এ-সম্পর্কে সু-সংবদ্ধ আলোচনা এখনও বিশেষ হয়নি। অথচ পুরানো বাংলা-বই ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে বার বার মনে হয়েছে একটা কিছু করা দরকার। আর তা করতে হলে এটাই বোধহয় উপযুক্ত সময়। আগামী বছর চার্লস উইলকিনস আর পঞ্চানন কর্মকারের অবিনশ্বর কীর্তি হলহেড-এর বাংলা ব্যাকরণ তথা বাংলা-বইয়ের দ্বিশতবার্ষিকী। তার আগে অতএব আগমনী গেয়ে রাখতে অপরাধ নেই। খবরটা অন্যদের কানে পৌঁছালেই আমি খুশি।

এই প্রবন্ধটি রচনাকালে পুঁথিপত্র এবং পরামর্শ দিয়ে যাঁরা আমাকে ক্রমাগত উৎসাহ জুগিয়ে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন: সত্যজিৎ রায়, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, পরিতোষ সেন, শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর কিউরেটার নিশীথরঞ্জন রায়, এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক শিবদাস চৌধুরী, শ্রীরামপুরের কেরী-লাইব্রেরির সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার তরুণ মিত্র, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামপুরের প্রবীণ সংগ্রাহক ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, মলয়কুমার চক্রবর্তী, সনৎকুমার গুপ্ত এবং

নানা গ্রন্থাগারের বন্ধুরা। শ্রীরামপুরে আসাযাওয়ার দিনগুলোতে নানাভাবে সাহায্য করেছেন—সোমনাথ মুখোপাধ্যায়।

এ'দের মধ্যে বন্ধুবর রাধাপ্রসাদ গুপ্তের সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বস্তুত তাঁর অতি মূল্যবান সংগ্রহ হাতের কাছে না-থাকলে আমার পক্ষে এত দ্রুত এই বই লেখা সম্ভব হত না। অনেক দুষ্প্রাপ্য প্রতিলিপিই তাঁর সৌজন্যে মুদ্রিত।

অন্যান্য পুরানো বইয়ের প্রতিলিপি সংগ্রহে যে-সব প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পেয়েছি তাদের মধ্যে আছে ঃ জাতীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি, শ্রীরামপুরের কেরী লাইব্রেরি, উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি এবং লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি। এ-কাজে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন এশিয়াটিক সোসাইটির অশোক সিংহ, আনন্দবাজার পত্রিকার অলক মিত্র এবং বন্ধুবর অমিয় তরফদার। ছবি ছাপার কাজে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন—বাদল বসু। প্রুফ সংশোধন করেছেন ঃ রঞ্জন ভাদুড়ি এবং রাধানাথ মণ্ডল। নির্ঘণ্ট করে দিয়েছেন এশিয়াটিক সোসাইটির বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। সহযোগিতায় ছিলেন পার্থ বসু ও রাধানাথ মণ্ডল। এ'দের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাই বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের কর্মকর্তাদের, বিশেষ করে পরিমল চন্দ্রকে। তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা এই বইটি প্রকাশে যে-উৎসাহ ও ঔদার্য দেখিয়েছেন তা আমার চিরদিন মনে থাকবে।

কলকাতা
১ মে, ১৯৭৭

শ্রীপান্থ

"—কলের খুরে দণ্ডবৎ, জুড়ে গেল গ্রামনগর!" গেয়েছিলেন রূপচাঁদ পক্ষী। তাঁর "কলিকাতা বর্ণনা" পদ্যটিতে অনেক কলের কথাই আছে ;—"পাটের কল আর ময়দার কল, রেড়ির কল, কাপড়ের কল, সুরকির কল, জল তোলা কল, খোয়া ভাঙগা কল।" অবাক হয়ে দেখেছিলেন তিনি—"কলাকৃতি ঐরাবৎ করে এক দিবসে সোজা পথ।" এমন-কি ভবিষ্যৎবাণী ছিল তাঁর—"এর পরে কলেতে বানাবে ছেলে!" অথচ আজব ব্যাপার দীর্ঘ পদ্যে কোথাও নেই সেই কলটির কথা যাকে বাদ দিলে বিকল হয়ে যায় শহর কলকাতা। কেননা, সভ্যতা আধুনিকতা সব ওই কলের চাকায় বাঁধা। আমরা ছাপাখানার কথা বলছি।

"কল" কথাটা ঈষৎ হালকা। প্রাচীনেরা অতএব বলতেন যন্ত্র। গাম্ভীর্য ঐশ্বর্য মাহাত্ম্য—সব যেন নিহিত ওই একটি শব্দে, বিধৃত নতুন কালের নতুন তন্ত্রের বীজমন্ত্রও বুঝি। উনিশ শতকের কলকাতায় "যন্ত্র" বলতে একটি যন্ত্রকেই বোঝাত, মুদ্রণযন্ত্র। যন্ত্রা-লয় মানে তখন আর কোনও যন্ত্রের ঘর নয়, ছাপাখানা। যথাঃ মথুরানাথ মিশ্রের যন্ত্রালয়, মহিন্দিলাল যন্ত্রালয়, পীতাম্বর সেনের যন্ত্রালয়, শিয়ালদহের সিন্ধু যন্ত্র, সংস্কৃত যন্ত্র, বাপ্তিস্ত মিশন যন্ত্র, নূতন স্টীম মেশিন যন্ত্র ইত্যাদি। কেউ কেউ "যন্ত্রাগার" শব্দটাও ব্যবহার করতেন অবশ্য। যেমন "মেং বহুবাজারে শ্রীলেবেণ্ডর সাহেবের যন্ত্রাগার"। তবে সকলের কাছেই বিশ্বকর্মার যন্ত্র বলতে যেন ওই একটিই,—ছাপার যন্ত্র। "যন্ত্রিত" মানে তখন

কলে চাপানো চট বা কাপড় নয়, মুদ্রিত। সেই স্মৃতিই বোধহয় এখনও বহন করছে যন্ত্রস্থ!

এই যন্ত্রটি যে আর সব যন্ত্র থেকে স্বতন্ত্র, বলতে গেলে অনন্য, সে-সংবাদ গোপন ছিল না কারও কাছে। তাই দেখি সেকালের খবরের কাগজে সালতামামি লিখতে বসে নতুন ছাপাখানার কথাও সসম্ভ্রমে উল্লেখ করছেন ওঁরা।[১] ১২৮৫ সনে খিদিরপুরে খালের ওপর নতুন "লৌহময় সেতু" গড়া হয়েছে, সিপাহীদের গঙ্গাজল স্পর্শ করে শপথ নেওয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, "আসাম অবধি মণিপুর পর্যন্ত" নতুন পথ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে, ইত্যাদি নানা বৃহৎ কাণ্ড। তারই মধ্যে বিশেষ খবর—"শালিখাতে শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিশোপ সাহেবের এক নূতন ছাপাখানা হয়।...(এবং) কলিকাতার কোম্পানির কলেজের অন্তঃপাতি সংস্কৃত যন্ত্রালয়" নামে আর একটি নতুন ছাপাখানা। বোঝা যায় দেশসুদ্ধ মানুষ তখন জেনে গেছেন—"যে দেশে ছাপার কর্ম চলিত না হইয়াছে সে দেশকে প্রকৃত রূপে সভ্য বলা যায় না।"

কেমন করে এদেশে সেই ছাপার কর্ম চালু হলো সে-এক রোমাঞ্চকর উপাখ্যান। অবশ্য দেশ-গৌরবে অতিগর্বিতদের কথা অন্য। তাঁদের ধারণা মিছিমিছি পরদেশীদের বাহবা দিই আমরা, ছাপাখানা এদেশে বরাবরই ছিল। না, হরপ্পা-সভ্যতার সেই সব সীলমোহর, কিংবা ধাতুর পাতে হরফ খোদাই বা তুলট কাগজে ব্লক ছাপার কথা পাড়েন না ওঁরা,[২] আলাদা আলাদা ধাতব হরফ সাজিয়ে ছাপবার করণ-কৌশলও নাকি জানা ছিল আমাদের। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে "নববার্ষিকী" নামে একটি বাংলা সাময়িকপত্রে লেখা হয়েছিল—"বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষে যে মুদ্রাযন্ত্র ছিল তাহার একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালীন তিনি দেখিতে পান যে, বারাণসী জেলার এক স্থলে মৃত্তিকার কিছু নীচে পশমের ন্যায় আঁশাল একরূপ পদার্থের একটি স্তর রহিয়াছে। মেজর রুবেক

ইহার সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হন এবং সে-স্থান খনন করিয়া একটি খিলান দেখিতে পান। পরিশেষে খিলানের অভ্যন্তর দেশে প্রবেশ করিয়া দর্শন করেন যে, তথায় একটি মুদ্রাযন্ত্র ও স্বতন্ত্র অক্ষর মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত সাজানো রহিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র ও অক্ষর পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত হয়, সে সকল একালের নয়, অন্যূন এক সহস্র বৎসর এই অবস্থায় রহিয়াছে।" মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। "নববার্ষিকী"র এই হঠকারিতার জবাব দিয়েছিল ১২৭৪ সালের আশ্বিন মাসের "বঙ্গদর্শন"। বঙ্গদর্শন সম্পাদক হেসে খুন। ওঁরা লিখেছিলেন—"সংগ্রহকার এই সংবাদ কোথায় পাইয়াছেন তাহা বিশেষ করিয়া লিখিলে ভাল হইত। না লেখায় এই পরিচয় অনেকের নিকট গ্রাহ্য হইবে না। মুদ্রাযন্ত্র প্রাচীনকালে চীনদেশে ছিল কিন্তু ভারতবর্ষে যে ছিল এমত কাহারও বিশ্বাস নাই। এক্ষণে তাহা বিশ্বাস করিতে হইলে বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক। শুনা যায় Gentleman's Magazine নামক একখানি সামান্য পত্রে এই কথা লিখিত হইয়াছিল কিন্তু তাহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা প্রথমে তদন্ত করা উচিত ছিল।" ১৮০৩ সনে আগ্রা দুর্গেও নাকি ক'জন সাহেব দেখতে পেয়েছিলেন একটি পুরানো ছাপাখানা। হতে পারে।[৩] তবে গুজব রটাবার প্রবণতা কিন্তু একালেও দেখা গেছে। কিছুকাল আগে কে. এম. মুন্সীর মতো দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে বলতে শোনা গেছে —শিবাজী মহারাজের আধুনিক ছাপাখানা ছিল। পরে জানা গেছে এই উক্তির পেছনে যথেষ্ট প্রমাণ নেই। শিবাজীরও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার বাসনা ছিল বটে, কিন্তু সন্ধানীরা তন্নতন্ন করে খুঁজে রায় দিয়েছেন—সে-বাসনা অপূর্ণ। ছাপাখানা তিনি চালু করতে পারেননি।[৫]

সুতরাং, স্বীকৃত ইতিহাসকে স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। মেনে নেওয়া ভাল এদেশে ছাপাখানার প্রবর্তক—পর্তুগীজরা। গোয়ায় তাদের প্রথম ছাপাখানা জাহাজ থেকে নামানো হয় ১৫৫৬ সনের ৬

সেপ্টেম্বর। সে ছাপাখানা থেকে প্রথম বই ছাপা হয়ে বের হয় ১৫৫৭ সনে। সে বই একালে কেউ চোখে দেখেননি। বলা হয় তার আগের বছরও (১৫৫৬) একখানা বই ছাপা হয়েছিল গোয়ার সেই ছাপাখানায়। সেটিও খুঁজে পাওয়া যায় না। বস্তুত ১৫৫৬ থেকে ১৫৬১ পর্যন্ত গোয়ায় ছাপা পাঁচখানা বইয়ের মধ্যে একখানাও এখন অবধি কারও চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। এদেশে ছাপার প্রথম নিদর্শন হিসাবে যে-বইটি এখনও রয়েছে সেটি—১৫৬১ সনে ছাপা Compendio Spiritual Da Vida Christa. ১৮৬২ সনে লুণ্ডনে নিলামে বিক্রি হয়েছিল এটি। এখন রয়েছে নিউইয়র্কের পাবলিক লাইব্রেরিতে। গোয়ার পর ছাপার কেন্দ্র—কুইলন। সেখান থেকেই তামিল মালায়লম হরফে ১৫৭৮ সনে ছাপা হয় প্রথম স্বদেশী বই—ষোল পৃষ্ঠার Doutrina Christa. সেখান থেকে কোচিন। তারপর কন্যাকুমারীর কয়েক মাইল উত্তরে পুণ্ডিকাইল। তারপর ভিপিকোট্টা ; আমবালাকাড,—ট্রাংকুইবার, মাদ্রাজ,—হুগলি। ছাপাখানার আনাগোনার এই মানচিত্র মনে হয় এখনও অস্পষ্ট। তবে বোঝা যায় অগ্রগতি তার উপকূল ধরে।[৬]

দক্ষিণী ভাষায় প্রথম বই—১৫৭৮ সনে। অথচ এ তল্লাটে প্রথম ছাপা বই ১৭৭৮ সনে। কুইলন থেকে হুগলি—ঠিক দুশ' বছরের দূরত্ব। অবিশ্বাস্য! অথচ ঘটনাটি সত্য। কেন? অনেক কারণই থাকা সম্ভব। তবে এটাও ঠিক, প্রথম দিকে ছাপাখানা সত্যিই হাঁটি-হাঁটি-পা-পা। ইউরোপের কথাই ধরা যাক। জার্মানীতে ছাপাখানা এলো যদি ১৪৫৪ সনে, ইতালিতে তবে ১৪৬৫ সনে, সুইজারল্যাণ্ডে ১৪৬৮ সনে, ফ্রান্সে ১৪৭০ সনে, হল্যাণ্ডে—১৪৭৩ সনে, স্পেনে ১৪৭৪ সনে। আর ইংল্যাণ্ডে? আরও পরে,—১৪৭৬ সনে। ক্যাক্সটনের পাঁচশ' বছর পূর্তি উৎসব পালিত হয়েছে সেখানে গত বছর। গায়ে গায়ে লাগোয়া দেশ, তবু এই গদাইলশকরি চাল,—ইংলিশ চ্যানেল পার হতে একুশটি বছর লেগে গেল আজব-যন্ত্রের![৭]

সেদিক থেকে বিবেচনা করলে গোয়া থেকে হুগলি বা কলকাতা অবশ্যই অনেক দূর, যেন একই দেশে দুটি বিন্দু নয়, দুইয়ের মধ্যে মহাদেশের ব্যবধান। এ-দূরত্ব শুধু ভৌগোলিক নয়, দুই এলাকার রাজনৈতিক পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতেও বিস্তর তারতম্য। ছাপাখানার আগে বিদেশীর কাছে নিশ্চয়ই জরুরী তখন স্থায়ী ঠিকানা। কী ছাপবো, কার জন্য, এসবও অবশ্যই পরদেশীর পক্ষে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। সুতরাং, হুগলিতে ছাপাকলওয়ালা অ্যানড্রুস সাহেবের জন্য পাকা দুশো বছর অপেক্ষা করে বসে না-থাকা ছাড়া আমাদের গতি কী?

১৭৭৮ সনে তাঁর 'যন্ত্র' থেকেই ছাপা হয়ে বের হয়েছিল হলহেডের ব্যাকরণ। ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেডকৃত "গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ"। ইংরাজী বই, কিন্তু পাতায় পাতায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত আর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর থেকে উদ্ধৃতি। উদ্ধৃতিগুলো সব বাংলা হরফে। সুতরাং, ছাপার আরশিতে সেই প্রথম বাঙালীর বাংলা হরফ দেখা।

তার মানে এই নয় যে, বাংলা হরফের সেদিনই জন্মদিন। বাংলা হরফ এবং বাংলা ভাষা দুই-ই অতি প্রাচীন। সমান রোমাঞ্চকর তার বিবর্তনের কাহিনীও। এখানে তা অবান্তর। আমাদের এই সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান বাংলা হরফ এবং বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ছাপাখানার সম্পর্ক নিয়েই।[১]

বলে রাখা ভাল, মুদ্রাযন্ত্রের সঙ্গে বাংলা ভাষার প্রথম পরিচয় হুগলিতে নয়,—দূর লিসবনে। একটি নয়, বলতে গেলে প্রায় এক সঙ্গে তিন-তিনটি বাংলা বই ছাপা হয় সেখানে ১৭৪৩ সনে। বই-গুলোর নাম তো বটেই, কিছু কিছু ছত্রও বাংলা সাহিত্যের ছাত্রদের মুখস্থ।—"দোস্ত বেঙ্গলী শোনোঃ পুথি সকলের উতম পুথি, শাস্ত্র সকলের উতম শাস্ত্র, শাস্ত্রী সকলের উতম শাস্ত্রী ক্রেপার শাস্ত্রী, ক্রেপার শাস্ত্র এবং ক্রেপার শাস্ত্রের পুথি"। "কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-

ভেদ” বা “বেদ”-এর কথা অনেকেরই জানা। দূর লিসবন শহরে ছাপা হয়েছিল বইটি। তার আগে সেখানে “যন্ত্রিত” হয়েছে আরও একখানা বাংলা বই—“ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ।” তৃতীয় বইটি একখানা বাংলা ব্যাকরণ ও পর্তুগীজ বাংলা শব্দকোষ। সবই ছাপা হয় এক বছরে, ১৭৪৩ সনে।

এর মধ্যে “ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ”-এর লেখক একজন বাঙালী। তাঁর নাম যদিও দোম আন্তনিয় দো রোজারিও, গবেষকরা বলেন—তিনি আসলে ভূষণার রাজকুমার, মগ দস্যুদের হাতে পড়ে ভাগ্যের ফেরে দেশান্তরী এবং অবশেষে রোমান ক্যাথলিক।

অন্য বই দুটির লেখক পাদ্রী মানোয়েল-দা-আস্-সুম্প্ সাম্। এছাড়াও শোনা যায় ১৭৬৫ সনে বা তার কয়েক বছর পরে লণ্ডনে ছাপা হয়েছিল আরও দুখানা খ্রীষ্টীয় বই, বেণ্টো ডি সেলভেস্ত্রে বা ডিসুজা রচিত “প্রশ্নোত্তরমালা” এবং “প্রার্থনামালা”। তবে লিসবনে এবং লণ্ডনে ছাপা এই পাঁচখানা বইয়ের প্রত্যেকটিতেই বাংলা হরফের চেহারা অন্যরকম,—সবই ছাপা হয়েছিল রোমান হরফে। বেশবাস দেখে কে বলবে তা বাংলা! হুগলির ঘটনাটি সে-কারণেই যুগান্তকারী।

অবশ্য হুগলির আগেও বাংলা হরফ ছাপা হয়েছে কিছু কিছু। মুদ্রাযন্ত্রের সঙ্গে বাংলা লিপি মুখোমুখি হয়েছে আগেও। তবে বিদেশে। এবং সে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেছে আলাদা আলাদা হরফ সেজে-গুজে একসঙ্গে দল বেঁধে নয়, চলৎশক্তিহীন ব্লকযোগে। দুইয়ের মধ্যে, সবাই জানেন, আশমান-জমিন ফারাক। ছাপা বলতে আমরা বুঝি নড়াচড়ায় সক্ষম এমন হরফ সহযোগে ছাপা। সে-হরফ নড়বড়ে কাঠের হরফ নয়,—ধাতুর। ইংরাজীতে যাকে বলে—“মুভএবল মেটাল টাইপ”।

সজনীকান্ত দাস তাঁর বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে লিখেছেন ব্লকযোগে বিদেশে বাংলা লিপি ছাপা হয়েছিল কুল্যে ছ’খানা বইয়ে।

এতকাল অন্যান্য গবেষকদেরও তা-ই ছিল ধারণা। কিন্তু সেটা ভুল। ছয় নয়, এ-ধরনের বইয়ের সংখ্যা হবে কমপক্ষে আট। সজনীবাবুর তালিকা শুরু হয়েছিল ১৬৯২ সনে প্যারিসে ছাপা একখানা বই দিয়ে। বইটির লেখক কয়েকজন জেসুইট যাজক। বইয়ের বিষয়ঃ ভারতের ইতিহাস, ভূগোল, জলবায়ু, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি। লাতিনে ছাপা ১১৩ পৃষ্ঠার বই, ৭৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রয়েছে 'বাংলাদেশের জনসাধারণের লিপি'র নমুনা। কিন্তু সম্প্রতি শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে (যুগান্তর, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৭) দেখিয়েছেন তার বেশ কিছুকাল আগে, ১৬৬৭ সনে আমস্টারডাম থেকে প্রকাশিত একটি বইয়েও মুদ্রিত রয়েছে বাংলা লিপির নমুনা। সে বইয়ের সংক্ষিপ্ত নাম—"চায়না ইলাস্ট্রেটা"। লেখক—আতানাসিউস কির্খের। সজনীবাবুর লেখায়ও এই বইটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন—এ বইয়েই প্রথম মুদ্রিত হয় দেবনাগরী লিপি। কথাটা হয়তো ঠিক। কিন্তু একটু সতর্কভাবে পাতা ওলটালে দেখা যায় এই বইয়ে "অ্যালফা বেটাম বেঙ্গলিকাম" বা বাংলা লিপির নমুনাও লভ্য। লিপিগুলো অবশ্য সব সমান সুস্পষ্ট নয়, তবু মুখ চিনতে কোনও অসুবিধা নেই।

তার পর বাংলা লিপির দেখা মেলে সজনীকান্তের তালিকায় দ্বিতীয়, আর আমাদের তালিকায় তৃতীয় বই—"আউরঙ্গজেব"-এর পাতায়। এটি ছাপা হয়েছিল লাইপজিগ-এ, ১৭২৫ সনে। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে মোগল সম্রাট আউরঙ্গজেবের কাহিনী। ৮৪ পৃষ্ঠার বই। তাতে ১ থেকে ১১ পর্যন্ত বাংলা সংখ্যা ছাড়াও মুদ্রিত রয়েছে বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ এবং বাংলা হরফে একটি জার্মান নাম—শ্রীসরজন্ত বল্‌পকাং মাএর। লাতিন হরফে নামটি অবশ্য—Sergeant Wolfgang Meyer. এই প্লেটটি ক' বছর পরে ১৭৪৮ সনে আরও একটি বইয়ে পুনর্মুদ্রিত। সেটিও ছাপা হয় লাইপজিগ-এ। তার এক পাতায় "অ্যালফাবেটাম বেঙ্গলিকাম" বা বাংলা বর্ণমালার

নমুনা হিসাবে ওই ব্লকটিই ছাপা রয়েছে। ইতিমধ্যে ১৭৪৩ সনে লাইডেন-এ ডেভিড মিল সাহেব প্রকাশ করেছেন আর একখানা বই। নাম— Dissertio Selecta. লাতিন বই। ব্যাকরণ আলোচনা অংশে বাংলা এবং দেবনাগরী অক্ষরে নমুনা পরিবেশিত। ষষ্ঠ বইটির মুদ্রাকর বিখ্যাত ইংরাজ টাইপ-নির্মাতা জোসেফ জ্যাকসন। ১৭৭৩ সনে ওলন্দাজ ভাগ্যান্বেষী উইলিয়াম বোল্টস তাঁকে দিয়ে লণ্ডনে ছাপালেন "আধুনিক সংস্কৃত" ওরফে বাংলা হরফের নমুনা।[১১]

হুগলির আগে সে-হরফের মুখ আবার দেখা গেল লণ্ডনে ১৭৭৬ সনে। লেখক আমাদের সুপরিচিত সেই হলহেড সাহেব। ১৭৭৬ সনে, অর্থাৎ হুগলিতে ব্যাকরণ ছাপাবার দু'বছর আগে তিনি যে বইখানা প্রকাশ করেন তার নাম— A Code of Gentoo Laws. বইটিতে দুটি ব্লক দিয়ে ছাপানো হয় কিছু বাংলা ও সংস্কৃত শব্দ।

অনেকের ধারণা ছিল তার পরেই বুঝি হুগলি-উপাখ্যান। চলনক্ষম ধাতব-হরফ হিসাবে বাংলা লিপির আত্মপ্রকাশ। কিন্তু আমাদের আরও একখানা বইয়ের সন্ধান দিয়েছেন শ্রীরাধাপ্রসাদ গুপ্ত। বইটি ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন অনুদিত "আইন-ই-আকবরী"র একটি খণ্ড। ১৭৭৭ সনে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত। অর্থাৎ, হুগলি-কাণ্ডের আগের বছরে ছাপা। তার শেষে "অ্যান এশিয়াটিক ভোকাবুলারি" নামে গ্ল্যাডউইন-প্রস্তাবিত আরও একটি বইয়ের বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি আছে। গ্রাহকদের দেখাবার জন্য নমুনা হিসাবে ইংরাজী, সংস্কৃত এবং নাগরী লিপির সঙ্গে তিনি বাংলা লিপির নমুনাও ছাপিয়ে দিয়েছেন। এক-আধটি নয়, সে-বিজ্ঞপ্তিতে চার-চারটি পাতা জুড়ে রয়েছে মুদ্রিত বাংলা লিপি। অবশ্য সবই প্লেট। গুপ্ত-মশাইয়ের সংগ্রহেই রয়েছে এই পুঁথি। তাই বলছিলাম ছয় নয়, হুগলির আগে বাংলা লিপির নমুনা ছাপা হয়েছে কমপক্ষে আট-খানা বইয়ে। প্রথমটি তার ছাপা হয়ে থাকে যদি ১৬৬৭ সনে, শেষটি

তবে ১৭৭৭ সনে। কে জানে, তেমন করে খুঁজলে হয়তো অন্য নমুনাও মিলে যেতে পারে।

বাংলা লিপির এই সব নমুনা, বলা বাহুল্য, দেখতে এক-একটি এক-এক রকম। চেহারায় এই যে রকমফের, তার কারণ শুধু কালগত নয়,—অনেকাংশে ব্যক্তিগত। সব লিপিকরের হাতের লেখা এক রকম নয়, সুতরাং মুদ্রিত প্লেটে লিপির ভিন্ন চেহারা। হুগলিতে ছাপা হরফের সঙ্গে প্লেট-যোগে ছাপা এই সব নমুনার প্রধান পার্থক্য এই, এগুলো একান্তভাবেই ব্যক্তিগত, অন্যদিকে ব্যক্তিবিশেষের হাতের লেখার আদলে কাটা হলেও যান্ত্রিক কারণে ও প্রয়োজনে চলনশীল ধাতব হরফ নৈর্ব্যক্তিক। যন্ত্রসভ্যতার বৈশিষ্ট্য যে "ইউনি-ফরমিটি" আর "স্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন" তা-ই প্রতিফলিত হুগলির উদ্যোগ আর তার ফলাফলে। হলহেডের ব্যাকরণে বাংলা লিপি সেই প্রথম অঙ্গে তুলে নিল সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম—ছাঁচে-ঢালা হরফ। হরফের পর হরফ সুশৃঙ্খলভাবে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে,—দেখবার মতো দৃশ্য বইকি।[১২]

লণ্ডনের পরেই হুগলি। মিঃ অ্যানড্রুস-এর ছাপাখানা।[১৩] চার্লস উইলকিনস। পঞ্চানন কর্মকার। হাতে তাঁদের "জেণ্টুল"-এর লেখক সেই ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেড[১৪] সাহেবের পাণ্ডুলিপি। হস্তলিপির বদলে হরফ চাই। কাঠ বা ধাতু খোদাইয়ের বদলে ছাঁচে ঢালা বর্ণমালা। হলহেড বইটি লিখেছিলেন রাজকার্যে সুবিধের জন্য। হেস্টিংস তখন গভর্নর জেনারেল। বলতে গেলে তিনিই লেখকের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁরই অনুরোধে বই ছাপাবার দায়িত্ব নিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত উইলকিনস। তাঁর জানা ছিল লণ্ডনে বোল্টস বাংলা হরফ তৈরি করাবার চেষ্টা করেছিলেন। পারেননি। "ছেনি-কাটা সাট"-এর বদলে ব্লক দিয়েই কাজ সারতে হয়েছে তাঁকে। তাছাড়া উইলকিনস নিজেই চেষ্টা করছিলেন বাংলা হরফ তৈরি

করতে। করিয়েও নাকি ছিলেন। বন্ধু হলহেডের বই ছাপাবার জন্য আবার তিনি উদ্যোগী হলেন। এবং এবার সম্পূর্ণ সফল। হলহেড তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখেছেন, ছেনি কাটা থেকে শুরু করে হরফ ঢালাই ছাপা সবই করেছেন তিনি নিজের হাতে। চার্লস উইলকিনস অতএব সংগত কারণেই আমাদের ক্যাক্সটন।[১৫] আর দ্বিতীয় গৌরবের আসনটি প্রাপ্য, বলা নিষ্প্রয়োজন, পঞ্চানন কর্মকারের। প্রথম বাংলা বই তথা এ তল্লাটে প্রথম বই ছাপার কাজে আগাগোড়া তিনি সহকারীর ভূমিকায়। আগামী বছর (১৯৭৮) বাংলা বইয়ের দ্বিশতবার্ষিকী। সার চার্লস উইলকিনস-এর সঙ্গে সেদিন নিশ্চয় বাঙালী সগৌরবে স্মরণ করবে পঞ্চাননের নাম।[১৬] বিশেষত হলহেডের ব্যাকরণ ছাপা শেষ হওয়ামাত্রই নামটি যখন বিলীন হয়ে যায়নি।

হুগলির পর বাংলা বই ছাপার কেন্দ্র সরে এলো শ্রীরামপুরে। সেখানে পঞ্চানন আরও উজ্জ্বল নাম। নিপুণ কারিগর। সে-সব কর্মকাণ্ডের সূচনা ১৮০০ সনে। ইতিমধ্যে কলকাতায়ও উঁকি দিয়েছে বিশ্বকর্মার এই কল। অনেকের ধারণা, ১৭৮০ সনে যে ছাপাখানা থেকে জেমস অগাস্টাস হিকি তাঁর বিখ্যাত "বেঙ্গল গেজেট" ছেপেছিলেন, শহর কলকাতায় সেটাই প্রথম ছাপার কল। মার্গারিটা বার্নস খবর করেছেন—কলকাতায় প্রথম সরকারী ছাপাখানা বসানো হয় ১৭৯৯ সনে। এবং সে ছাপাখানাও ছিল চার্লস উইলকিনস-এর পরিচালনাধীনে।[১৭] হিকি অবশ্য দু' হাজার টাকা খরচ করে তাঁর ছাপাখানা বসান তার আগের বছর, ১৭৭৮ সনে। ১৭৮০ সনের ২৯ জানুয়ারি "বেঙ্গল গেজেট" অথবা "ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভারটাইজার" ছাপা শুরু করার আগে সরকারী ছাপার কাজও করেছেন তিনি। পাঠকদের কাছে নিজেই নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন "দি ফার্স্ট অ্যান্ড লেট প্রিন্টার টু দি অনারএবল কোম্পানি" বলে। তার অর্থ হুগলিতে যখন হলহেডের বই ছাপা হচ্ছে, কলকাতায়ও তখন গড়ে উঠেছে ছাপার ব্যবস্থা। ব্যবস্থা হয় সম্পূর্ণ না হয় এই

হল বলে। উইলকিনস হুগলিকে সাধনপীঠ করেছিলেন সম্ভবত বাংলা হরফের জন্যই। তাছাড়া হলহেড এবং উইলকিনস, কর্মসূত্রে দুজনই নাকি তখন হুগলিতে।

হিকির গেজেটের যাত্রা শুরু হতে না-হতে ক-মাসের মধ্যে ১৭৮০ সনের নভেম্বরে থিয়েটারওয়ালা বি মেসিঙ্ক আর লবণের গোলাদার পিটার রীড সাহেবের মিলিত উদ্যোগ—"ইন্ডিয়া গেজেট"। সাহেবপাড়ায় দ্বিতীয় সংবাদপত্র। তার চার বছর পর (৯৭৮৪) সরকারী পৃষ্ঠপোষণায় যাত্রা শুরু বিখ্যাত "ক্যালকাটা গেজেট"-এর।[১৮] এই গেজেটের এক বৈশিষ্ট্য বাংলা হরফে বাংলা বিজ্ঞাপন। গণজাগরণ তথা জনমত গড়ার সঙ্গে ছাপাখানার কী সম্পর্ক পর পর এতগুলো খবরের কাগজের আবির্ভাবে ইঙ্গিত মেলে তার। আদ্যিকালের সাংবাদিকদের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক প্রকারান্তরে জানিয়ে দিচ্ছিল ছাপাখানা আর ধানভানা-কল এক বস্তু নয়। অসি বনাম মসীর লড়াই দেখা গেল প্রথম সংবাদপত্র হিকির গেজেট উপলক্ষেই। ১৮২৩ সনের এপ্রিলে প্রথম প্রেস-আইন। সেকালের কথায় "সম্বাদপত্র-শাসন আয়িন"। সংবাদপত্রের ওপর খবরদারি কার্যত শুরু হয়ে গেছে কিন্তু তার অনেক আগেই। কর্নওয়ালিস, ওয়েলেসলি—সবাই কখনও কখনও রীতিমত রক্তচক্ষু।

সে-প্রসঙ্গ থাক। বইয়ের কথাই বলি। হুগলিতে সাফল্যের পর ১৮০০ সনের মধ্যে বেশ কয়েকটি বই ছাপা হয়ে গেল এখানে-ওখানে। অনারএবল কোমপানির প্রেসে জনাথন ডানকান সাহেব ছাপলেন "ইমপে কোড", ১৭৮৫ সনে। ১৭৯১ এবং '৯২ সনে এডমনস্টোন সাহেব ছাপালেন বই আকারে আইনের আরও দুটি তর্জমা।[১৯] '৯২ সনে ছাপা হল আরও একটি বাংলা বই। এবার রীতিমত সাহিত্য-পুস্তক। উইলিয়াম জোনস সম্পাদিত কালি-দাসের ঋতুসংহার—"দি সিজনস"।[২০] সংস্কৃত বই। কিন্তু বাংলা হরফে ছাপা। ১৭৯৩ সনে স্বনামধন্য ফরসটার সাহেব ছাপালেন

"দি গ্রেট কর্নওয়ালিস কোড"-এর অনুবাদ। এটিও ছাপা হল সরকারী প্রেসে। তবে হরফ কিছুটা উন্নত। নতুন "সাট" তৈরি করে দিয়েছিলেন নাকি পঞ্চানন।[২১] ১৭৯৯ সনে ফেরিস কোমপানির ছাপাখানা থেকে বের হল তাঁর বিখ্যাত ভোকাবুলারি। অবশ্য, তার আগে ১৭৯২ সনে এ. আপজন কলকাতার ক্রনিকল প্রেস থেকে ছাপিয়েছেন "ইঙগরাজি ও বাঙগালি বোকেবিলরি"।[২২] তা ছাড়া ফরসটার-এর আগে ১৭৯৭ সনে ভাষা শিক্ষার আরও একটি বই ছাপা হয়েছিল। তার নাম—The Tutor. বাংলায়—"সিক্ষ্যাগুরু কিম্বা এক নৈতন ইংরাজি আর বাঙগালা বহি ভালো উপযুক্ত আছে বাঙগালিদিগকে ইংরাজি সিক্ষ্যা করাইতে।" লেখক—জন মিলার। এ বইটি কোথায় ছাপা হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক আছে। তার কথা পরে। আপাতত এটা বোঝা গেল—শ্রীরামপুরে মিশনারীরা ছাপাখানা বসাবার আগেই কলকাতায় বেশ কয়েকটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত।[২৩] সেখান থেকে বাংলা হরফেও দিব্যি চলছে বই ছাপার কাজ। হরফ তাঁরা কোথায় পাচ্ছেন সেটা অবশ্য খুব স্পষ্ট নয়। তবে ছাঁদ দেখে মনে হয়, সর্বত্রই বুঝি উইলকিনস আর পঞ্চাননের হাতের স্পর্শ। ১৭৯৮ সনে কলকাতার কোনও এক কাগজে নাকি এক বিজ্ঞাপনে জানানো হয়—হরফ ঢালাইয়ের একটি কারখানা স্থাপিত হয়েছে শহরে, সেখানে "কান্ট্রি ল্যাঙগুয়েজেজ" বা দেশীয় ভাষার হরফও মিলবে। আরও জানা যায়—হরফ গড়ছেন উইলকিনস-এর সহকারীরাই।[২৪] দ্বিতীয় জ্ঞাতব্য—প্রথম দিকে বিদেশীরা এই এলাকায় অন্তত ছাপাখানা নিয়ে পড়েছিলেন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য নয়, রাজত্ব পরিচালনায় সুবিধের জন্য। ১৮০০ সনের আগে পর্যন্ত যেসব বই বাংলা মুলুকে ছাপা হয়েছে, তার সবই ব্যাকরণ, আইন অথবা ভাষা শিক্ষার বই। অথবা সাহিত্য। সুতরাং ছাপাখানা মিশনারীরা হাতে তুলে নেন পরে, আগে নেতৃত্ব ছিল প্রকৃতিতে রাজনৈতিক। রাজকর্মে সুবিধের জন্য ভাষা শিক্ষায় আগ্রহী যেমন

বিদেশী রাজপুরুষ, তেমনই রাজভাষা শিখবার জন্য ব্যাকুল কিছু স্বদেশী মানুষও। ১৭৮৯ সনে তাই "ক্যালকাটা গেজেট"-এ দেখি "সেভারেল নেটিভস অব বেঙগল"-এর কাতর আবেদন,—ভাষা শিক্ষার বই চাই। বাংলার সঙ্গে ইংরাজী থাকবে এমন বই। এই আবেদনে সাড়া দিতেই যেন—"বোকেবিলরি" কিংবা "সিক্ষ্যাগুরু কিম্বা এক নৈতন ইংরাজি আর বাঙ্গালা বহি"।[২৫]

এবার তাকানো যাক শ্রীরামপুরের দিকে। ১৮১১ সনে ওয়ার্ড এক চিঠিতে বিবরণ[২৬] দিচ্ছেন শ্রীরামপুরের ছাপাখানার: ঢুকলেই দেখতে পাবে তোমার কাজিন (অর্থাৎ ওয়ার্ড নিজে) ছোট্ট একটি ঘরে বসে লিখছে অথবা পড়ছে। তার সামনে অফিস ঘর। লম্বায় একশ' সত্তর ফুট। সেখানে তুমি দেখবে ভারতীয়রা নানা ভাষায় শাস্ত্র অনুবাদ করছেন। অথবা প্রুফ সংশোধন করছেন। তোমার চোখে পড়বে খোপে খোপে সাজানো নানা হরফ—আরবী, পারসি, নাগরী, তেলেগু, পাঞ্জাবি, বাংলা, মারাঠী, চাইনিজ, ওড়িয়া, বার্মিজ, কানারিজ, গ্রীক, হিব্রু এবং ইংরাজী। ভারতীয় হিন্দু মুসলমান এবং খ্রীষ্টান কর্মীরা ব্যস্ত। তাঁরা হরফ সাজাচ্ছেন, সংশোধন করছেন, হরফ আবার খোপে খোপে রাখছেন। অফিসের ওদিকে টাইপ তৈরির কারিগররা। তাদের পাশেই আর একদল মানুষ কালি তৈরি করছে, আর খোলামেলা ওই দেওয়ালঘেরা গোল চত্বরে আমাদের কাগজকল।—আমরা নিজেরাই তৈরি করি আমাদের কাগজ। সতের শতকের ইউরোপীয় ছাপাখানার ছবির সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে যেন শ্রীরামপুরের বিবরণ। শুধু সাহেবদের জায়গায় ইতস্তত কিছু বাঙালী বসিয়ে দিলেই হল।

শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রতিষ্ঠা ১৮০০ সনে। সে বছরই কলকাতায় ওয়েলেসলির ফোরট উইলিয়াম কলেজ। দুইয়ে মিলে বাংলা সাহিত্য, বিশেষত গদ্য-সাহিত্যের জন্য কী করেছে তা

সকলের জানা। গদ্যের শৈশবে, বলাই বাহুল্য, তার শরীরমন গড়ার কাজে বিশেষ ভূমিকা ছাপাখানার। কেরী যে কাঠের ছাপাখানাটি নিয়ে বাংলাদেশের স্তিমিত হৃদ্‌পিণ্ডে হঠাৎ সেদিন স্পন্দন বাড়িয়ে তুলেছিলেন সেটি নীলকর উডনি সাহেবের দান। খিদিরপুর থেকে নিলামে মাত্র চল্লিশ কি ছেচল্লিশ পাউনডে কেনা। দাম যা-ই হোক, শ্রীরামপুরের এই কাঠের ছাপাখানা অবদানে কল্পতরু যেন। আনুষ্ঠানিকভাবে গদ্যে-লেখা প্রথম বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠার প্রুফ হাতে তুলে নেন ওঁরা ১৮০০ সনের ১৮ মার্চ, ছাপা শেষ হয় আগস্টের গোড়ায়। প্রকাশিত হল ডিমাই আট-পেজি ১২৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ রামরাম বসু ও টমাস অনূদিত "মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত"। এ-বইয়ের কম্পোজিটারের কাজ করেছিলেন নাকি ছাপাখানার পরিচালক ওয়ার্ড নিজেই। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন কেরীর চৌদ্দ বছরের ছেলে আর ব্রানসডন নামে আর একজন। তারপর একের পর এক বই প্রসব করে চলল শ্রীরামপুরের ছাপাখানা। অবশ্য ছাপার কলের সংখ্যাও বেড়েছে ক্রমে।[২৭] ১৮০১ থেকে ১৮৩২ সনের মধ্যে চল্লিশটি ভাষায় দুই লক্ষ বারো হাজার বই প্রকাশ করেছেন ওঁরা শ্রীরামপুর থেকে। ১৮৩৪ সনে প্রকাশিত মিশনের ১০ম কার্যবিবরণে বলা হয়েছে সর্বমোট সাতচল্লিশটি ভাষায় ধর্মপুস্তক ছেপেছেন ওঁরা, তার মধ্যে চল্লিশটির জন্য হরফ তৈরি করেছেন নিজেরাই। ১৮১৮ থেকে ২২ সনের মধ্যে কলকাতার স্কুল বুক সোসাইটিকে তাঁরা সরবরাহ করেছেন এক ডজন বই। মোট প্রিণ্ট অর্ডার—সাতচল্লিশ হাজার নয় শ' ছেচল্লিশ কপি। ১৮৩৭ সন থেকে অবশ্য শ্রীরামপুরের ছাপাখানা "সরকারীভাবে" বিলুপ্ত। সে-বছর কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের সঙ্গে মিলে একাকার হয়ে যায় শ্রীরামপুরের ঐতিহাসিক ছাপাখানা।[২৮] তার পরও শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত পুঁথিপত্র দেখা গেছে বটে, তবে মনে হয় সেসব বোধহয় আসলে "ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া" প্রেসে ছাপা।[২৯] ঘটনা যা-ই হোক,

এ-বিষয়ে কোনও বিতর্ক নেই যে আমাদের মুদ্রণ এবং প্রকাশন শিল্পের ইতিহাসে শ্রীরামপুর এক আলোক-মিনারের মতো। তার তুলনা নেই।[৩০]

শ্রীরামপুরের এই অবিশ্বাস্য সাফল্যের জন্য সংগতভাবেই গর্ব-বোধ করতে পারে বাঙালী। কেননা, লেখালেখি এবং ছাপার কাজ দুই ব্যাপারেই বাঙালী সেদিন রীতিমত সৃজনশীল।

পঞ্চাননদের কাছে নিজেদের কৃতজ্ঞতার কথা নিজেরাই স্বীকার করেছেন মিশনারীরা। সত্যি বলতে কী, পঞ্চানন কর্মকারকে না পেলে শ্রীরামপুরের ছাপাখানা এমন ভুবনমোহন হয়ে উঠত কি না ঘোরতর সন্দেহ। কেরী সাহেব প্রথমে বাংলায় বই ছাপতে চেয়েছিলেন বিলাতে। ১৭৯৫ সন থেকেই বাংলায় বাইবেল ছাপার ইচ্ছে তাঁর। খবর নিয়ে জানলেন, একটি হরফ ঢালাই করতে বিলাতে খরচ পড়বে ১৮ শিলিং। অন্তত ছ' শ' ছেনি দরকার। কমপক্ষে ৫৪০ পাউণ্ডের মামলা। হিসাব করে দেখা গেল দশ হাজার বই ছাপিয়ে আনতে একুনে দরকার—৪৩৭৫০ টাকা। ঠিক সে সময়ই দেবদূতের মতো সামনে এসে দাঁড়ালেন পঞ্চানন। বললেন—আমি তৈরি করে দেব হরফ। হরফ-পিছু খরচ পড়বে এক টাকা চার আনা। হাতে স্বর্গ পেলেন কেরী। মিশনের পত্তন হতে না-হতে দু মাসের মধ্যে সাহেবদের সঙ্গে যোগ দিলেন এক বাঙালী বিশ্বকর্মা। নাম তাঁর—পঞ্চানন কর্মকার।[৩১]

পঞ্চানন কি নিজেই ছুটে গিয়েছিলেন শ্রীরামপুরে? না কি পাদ্রী সাহেবরাই খুঁজে বের করেছিলেন তাঁকে? শোনা যায়, শ্রীরামপুরের যাজকরা কলকাতার সাহেবদের ফাঁকি দিয়ে সুকৌশলে হাত করেছিলেন পঞ্চাননকে। পঞ্চানন ত্রিবেণীর লোক। হুগলির ছাপাখানার সাফল্যের পর তিনি আস্তানা পেতেছিলেন কলকাতায় গারডেনরীচ-এ। সেখানেই থাকতেন তাঁর অন্নদাতা কোলব্রুক সাহেব। উইলকিনস দেশে ফিরে যান ১৭৮৬ সনে। তার পর থেকে পঞ্চানন

কোলব্রুকের সহচর। শ্রীরামপুরের মিশনারীরা কোলব্রুককে ধরে পড়লেন—আমরা পঞ্চাননকে চাই। দাবি নয়, কাতর আবেদন। আবেদনের পর আবেদন। কিন্তু কোলব্রুক অনড়। শ্রীরামপুর থেকে সাহেবরা তখন সরাসরি চিঠি লিখলেন পঞ্চাননের কাছে। চিঠির বক্তব্য—তোমাকে বেশি মাইনে দেব, পালিয়ে এসো। কিন্তু জবাবে পঞ্চাননের কোনও উৎসাহ দেখা গেল না। কেরী বাধ্য হয়েই আবার কোলব্রুকের শরণাপন্ন হলেন। এবার তাঁর আবেদন—আমরা খুবই বিপদে পড়েছি। অনুগ্রহ করে অন্তত দিন কয়েকের জন্য পঞ্চাননকে ছাড়ুন। কোলব্রুক এবার আর প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তিনি পঞ্চাননকে ক' দিনের জন্য ছুটি দিলেন। বললেন—একবার শ্রীরামপুর ঘুরে এসো। সেই যাওয়াই অগস্ত্যযাত্রা। পঞ্চাননের আর ফেরা হলো না শ্রীরামপুর থেকে। কোলব্রুক অনেক চেষ্টা করলেন তাঁকে "মুক্ত" করতে। তিনি ভারত সরকারের কাছে আরজি পেশ করলেন। কিন্তু কেরীও ওদিকে দিনেমার সরকারকে নামিয়েছেন আসরে। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক লড়াই এক বাঙালী কারিগরকে নিয়ে। কেরীর সওয়াল ছিল নাকি—কলকাতার ইংরেজ-দের কোনও অধিকার নেই এমন একজন কারিগরের ওপর একচ্ছত্র অধিকার বহাল করেন।—মনোপলি চলবে না, এই ছিল নাকি তাঁর শেলোগান।[৩২]

প্রথমে পঞ্চানন। তারপর তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন জামাতা মনোহর। যুবা মনোহরও ত্রিবেণীর সন্তান। হয়তো শ্বশুরের সঙ্গেই তিনি এসেছিলেন। হয়তো কিছু পরে। তবে সন্দেহ নেই, মনোহর পঞ্চাননের যোগ্য শিষ্য। শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানায় যোগ দেওয়ার বছর তিনেকের মধ্যেই (১৮০৩/ ৪) মারা যান পঞ্চানন। ছাপাখানার দায়িত্ব গ্রহণ করেন মনোহর। দীর্ঘ চল্লিশ বছর মিশনারীদের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। প্রথম আঠারো বছরেই তৈরি করিছেন চৌদ্দটি ভাষার "সাট"।[৩৩]

তাঁর পর ছাপাখানার সঙ্গে যুক্ত হন মনোহর-পুত্র কৃষ্ণ মিস্ত্রি। তিনিও দক্ষ কারিগর, নিপুণ শিল্পী। ১৮৫০ সনে তাঁর মৃত্যুর পর মিশনারীদের একটি কাগজ লিখেছিল—"ফলত পিতা এবং মাতামহ অপেক্ষা কৃষ্ণচন্দ্র শিল্পকর্মেতে অতি পটু।" মনোহর বাংলা ১২৪৫ সালে শ্রীরামপুরে নিজের যন্ত্রালয় স্থাপন করেন। সেখান থেকে প্রতি বছর একটি করে বাংলা পঞ্জিকা বের হতো। বের হতো ইংরাজী বাংলা নানা ধরনের বই। মনোহর মারা যান ১২৫৩ সনে। কৃষ্ণচন্দ্র বাবার ছাপাখানা কোনও মতে চালু রেখেই খুশি হতে পারেননি, নানাভাবে তার উন্নতির চেষ্টাও করেছিলেন। পঞ্জিকার ছবি সব তিনি নিজে আঁকতেন। ব্লকও নিজেই তৈরি করতেন। তা ছাড়া, "তিনি নিজে বুদ্ধিমতে এক লৌহময় যন্ত্র গঠন করিয়া তদ্দ্বারা পুস্তকাদি প্রকাশ করিতেন।" যাকে বলে—সত্যিকারের সৃজনশীল কারিগর। কৃষ্ণচন্দ্র প্রেমিক হিসাবেও শিল্পী। লোহা বা সীসার মতো সোনার কাজেও তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য। "সত্যপ্রদীপ" লিখেছিলেন—"ব্যক্ত আছে অতি প্রেয়সী ভার্যার নিমিত্তে তিনি অপূর্ব স্বর্ণময় এক হার নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার তুল্য সুরচিত প্রায় ধনাঢ্যের বাটীতেও দুষ্প্রাপ্য।" মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে হঠাৎ কলেরা কেড়ে নিয়ে গেল তাঁকে। মা তখনও বেঁচে আছেন। বেঁচে আছেন তরুণী স্ত্রী, যাঁর জন্য স্বামী নিজের হাতে গড়েছিলেন সেই অপরূপ কারুকার্যময় হার। ওঁদের কোনও ছেলেমেয়ে ছিল না। তবে কৃষ্ণচন্দ্রের দু'জন ভাই ছিলেন। মিশনারীরা শোক-সমাচার দিয়ে জানাচ্ছেন—"প্রত্যাশা রামচন্দ্র হরচন্দ্র নামক তদীয় সহোদরদ্বয় বর্তমান, তাঁহারাও কর্মক্ষম বটেন।"

সে প্রত্যাশা পূরণ করেছিলেন ওঁরা। কৃষ্ণচন্দ্রের পরিবারের সন্তানেরা একেবারে একাল পর্যন্ত টেনে এনেছিলেন পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য। এই সেদিন অবধিও নাকি বেঁচে ছিল শ্রীরামপুরে ওঁদের ছাপাখানা। এখনও শ্রীরামপুরের বটতলায় দাঁড়িয়ে ওঁদের বাড়ি।[৩৪]

মনোহর-কৃষ্ণচন্দ্রের ছাপাখানার নানা টুকিটাকি স্মৃতিচিহ্ন নাকি এখনও রয়েছে শ্রীরামপুরের পঁচাশি বছরের বৃদ্ধ গবেষক এবং সংগ্রাহক শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মশাইয়ের কাছে। সেগুলো নিজের চোখে দেখার সুযোগ আমার হয়নি। দেখেছি পুরানো কিছু পঞ্জিকা। কাঠখোদাই ছবিগুলো সত্যিই দেখবার মতো। তা ছাড়া ফণীবাবুর কাছে রয়েছে একটি বিতর্কিত মুদ্রিত বাংলা বই। নাম তার—"ধর্মপুস্তক"। বাইবেলের বাংলা অনুবাদ। লেখা আছে—"শ্রীরামপুরে ছাপা হইল ১৮০১"। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা—৮০০। এর আগের বছরে কেরী প্রকাশিত "মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত", কিংবা একই বছরে (১৮০১) মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত "ধর্মপুস্তক"-এর সঙ্গে আকারে-প্রকারে তার নাকি অনেক পার্থক্য। মিশন প্রেসে ১২৫ পৃষ্ঠার বই ছাপতে সময় লেগেছিল কয়েক মাস। আটশ' পৃষ্ঠার এ বই তবে কতদিনে ছাপা? স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে—তবে কি ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের ছাপাখানাই শ্রীরামপুরের প্রথম ছাপাখানা নয়? এ সম্পর্কে ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সংগ্রহের এই বইটি নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন শ্রীসুধীরকুমার মিত্র মশাই।[৩৫] আলোচনার অবকাশ হয়তো এখনও আছে। তবে মিশনারীরাও কিন্তু প্রথম দু' বছরে অনেক বড় বড় বই ছাপিয়েছেন। তা ছাড়া, পুরানো বইয়ের সব তালিকায় "ধর্মপুস্তক" ছাপার কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে এই ব্যাপটিস্ট মিশনারীদেরই।[৩৬]

দ্বিতীয়ত, ১৭৯৭ সনে মুদ্রিত জন মিলারের "সিক্ষ্যাগুরু" বইটিকে লঙ্ সাহেব চিহ্নিত করেছেন শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত বলে। কিসের ভিত্তিতে এই উক্তি আমরা জানি না। কেননা বইয়ের আখ্যাপত্রে কোনও ছাপাখানার নামধামের উল্লেখ নেই। তবে কেরী-পূর্ব শ্রীরামপুরে ছাপাখানার অস্তিত্ব হয়তো পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেননা সবাই জানেন, ট্রানকুইবার-এ (মাদ্রাজ) ১৭১২ সনে ছাপাখানা শুরু করেন দিনেমাররা। শ্রীরামপুরেও তাঁরা কিছু

করেছিলেন কিনা সেটা নিশ্চয়ই গবেষকদের অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারে। তবে ব্যক্তিগতভাবে এই লেখকের ধারণা সেটা গুজব। আমরা বহু চেষ্টা করেও এমন কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারিনি যাতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা যায় ১৭৯৭ সনেও ছাপাখানা ছিল শ্রীরামপুরে।[৩৭] আপাতত নতুন করে প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিয়ে আবার ফিরে যাচ্ছি কলকাতায়। সেখানে এতক্ষণে আরও নানা কান্ড।

উনিশ শতকের প্রথম প্রহরে কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় ছাপাখানা, আর ছাপাখানা। কলুটোলায় চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়, বহুবাজারে শ্রীলেবেণ্ডার সাহেবের ছাপাখানা, মীরজাপুরে মুনসী হেদাতুল্লার ছাপাখানা, পাশেই সম্বাদ তিমিরনাশক যন্ত্রালয়, আরপুলিতে বারাণসী আচার্যের মুদ্রণাগারের অদূরে শ্রীমন্ত রায়ের ছাপাখানা।... এ তালিকা ১৮২৪ সনের। দু' বছর পরেই দেখছি আরপুলিতে আরও একটি ছাপাখানা বসে গেছে—শ্রীহরচন্দ্র রায়ের প্রেস। ওদিকে শাঁখারিটোলায় বসেছে—বদন পালিতের প্রেস, শোভাবাজারে বিশ্বনাথ দেবের প্রেস, এবং মোং ইটালিতে শ্রীযুত পিয়ার্স সাহেবের ছাপাখানা এবং সমশুল আখবার প্রেস। ছাপাখানার ভূগোল বাড়ছে। বাড়ছে লাফে লাফে। কলকাতার চারদিকে পত্রপুষ্পশোভিত অক্ষর-বৃক্ষ। এ-শহরের সর্বাঙ্গে জড়ানো নতুন নামাবলী,—তাতে ছাপা হরফ আর ছাপা হরফ। মদনবাটীতে কেরীর ছাপাখানা নিয়ে সাহেবদের হৈচৈ দেখে অবাক বাঙালীরা নাকি ছাপাখানাটিকে আখ্যা দিয়েছিলেন "সাহেবদের ঠাকুর"! দেখা গেল অচিরে আমরাও মাথা নুইয়ে প্রণাম জানাচ্ছি তাকে।[৩৮]

প্রতি বছর ছাপা হচ্ছে নতুন নতুন বই। দেখতে দেখতে জমজমাট কলকাতার বটতলা। ১৮১৮-২০ সনের মধ্যেই বটতলায় স্থাপিত হয়েছে ছাপার যন্ত্র।[৩৯] ক্রমে সেখানে আরও যন্ত্র-ধ্বনি। যে দিকেই কান পাতা যাক ছাপাখানার আওয়াজ। উনিশ শতকের প্রথম দশকেই

নাকি চার-পাঁচটি ছাপাখানা ছিল কলকাতায়। তার মধ্যে চারটিরই পরিচালক স্বদেশী মানুষ। তালিকায় একটির নাম "সংস্কৃত যন্ত্র"। খিদিরপুরে এই "যন্ত্র" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাবুরাম আর লল্লু।[৪০] তৃতীয় দশকে পেঁৗছে কলকাতা বলতে গেলে যন্ত্রগতপ্রাণ। তাকে যেন ছাপা বইয়ের নেশায় পেয়ে বসেছে। ১৮৩০ সনে সমাচার-দর্পণ লিখছে—"এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে বিক্রয়ার্থে বাংলা পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথমোদ্যোগ কেবল ষোল বৎসরাধিক হইয়াছে ইহা দেখিয়া আমাদের আশ্চর্য বোধ হয় যে অল্পকালের মধ্যে এতদ্দেশীয় ছাপার কর্মের এমন উন্নতি হইয়াছে।" দর্পণ হিসাব পেশ করেছে নানা ছাপাখানা থেকে আগের বছর বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে ৩৭ খানা। শুধু তাই নয়, যে দেশে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় মাত্র বারো বছর আগে (সমাচার দর্পণের যাত্রারম্ভ ১৮১৮ সন। সে বছরই কিছু আগে অথবা কিছু পরে প্রকাশিত হয় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের কাগজ—"বাঙ্গাল গেজেট") তার গ্রাহক-সংখ্যাও "গত বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ হইয়াছে।" দর্পণ জানাচ্ছে পাঠকরা আগে বিদেশী সংবাদ মোটে পছন্দ করতেন না, অথচ এখন সব খবরের প্রতিই তাঁদের সমান আগ্রহ। ছাপাখানা শুধু নিজের অধিকার বাড়িয়েই ক্ষান্ত হয়নি, ধীরে ধীরে প্রসারিত করছে মানুষের মনের দিগন্তও।[৪১]

অথচ, বলে রাখা ভাল, ছাপাখানার পরিচালকদের সামনে পথ সেদিন আদৌ সরল বা মসৃণ ছিল না। ১৮২৯ সনে "বঙ্গদূত" জানিয়েছেন প্রতিরোধের সে-কাহিনী ঃ "পূর্বে অস্মদ্দেশীয় লোক কোন পত্র ছাপা অক্ষরে দেখিলে নয়ন মুদ্রিত করিতেন যেহেতু সাধারণের সাধারণবোধে ইহাই নিশ্চয় ছিল যে বর্ণান্তরীয় লোক ছাপায় কেবল আমাদিগের ধর্ম ছাপায়"।[৪২] ছাপাখানার এক শত্রু যদি রাজনৈতিক শক্তি, তবে আর এক শত্রু ধর্মীয়-সামাজিক কুসংস্কার। শোনা যায় চন্দ্রিকা-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমদ্‌ভাগবত ছেপে-

ছিলেন "বিশুদ্ধ হিন্দুমতে"। ছাপার কালি তৈরি হয়েছিল গঙ্গা-জল যোগে, কম্পোজিটররা সবাই ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ সন্তান। ভবানীচরণের সে-বইয়ের চেহারাও ছিল পুঁথির মতো,—আড়া-আড়ি।[৪৩] এ-সব করতে হয়েছিল তাঁকে, বলা নিষ্প্রয়োজন, সমাজের কুসংস্কার কাটাবার জন্য। সতীদাহ উচ্ছেদের মুখে যেমন চারদিক হঠাৎ সতীর চিতার ধোঁয়ায় অন্ধকার, ঠিক তেমনই ছাপাখানার প্রথম যুগে পাণ্ডুলিপির জন্য নানা মহলে নাকি বিশেষ ব্যাকুলতা। এক-দিকে চলছে ছাপার কাজ, অন্যদিকে পয়সাওয়ালা লোকেরা লিপিকর-দের দিয়ে পুঁথি লিখিয়ে বিনামূল্যে তা দান করছেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-দের। ইউরোপেও দেখা গেছে কোনও কোনও গ্রন্থরসিক ছাপানো বই পছন্দ করতেন না। কিন্তু সে অন্য কারণে। এক কারণ ছিল—ছাপা-বই বইকে সর্বজনীন করে তুলছে, সংগ্রহকারী হিসাবে নিজের কোনও বিশেষ গরিমা অতঃপর অবশিষ্ট থাকবে না। দ্বিতীয়ত, রুচির প্রশ্ন। ছাপা বই অনেকের দৃষ্টিতে পাণ্ডুলিপির ধারে-কাছে পৌঁছায় না! ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের দেশের প্রতিরোধ-কাহিনীর সঙ্গে এ-সকল কাহিনীর বোধ হয় খুব মিল নেই। কলের চিনি বা কলের জল, অথবা আলু-টম্যাটো সম্পর্কে যে কুসংস্কার তারই রকম-ফের দেখিয়েছেন কেউ কেউ ছাপা বই উপলক্ষে—এই যা।[৪৪] ক'দশকের মধ্যেই জানা গেল যা অনিবার্য তাই ঘটতে চলেছে। ছাপার কলের কাছে হার মানতে বাধ্য হচ্ছেন পুঁথি-লিপিকরের দল। ছাপা-বই দান করেও যে পুণ্য অর্জন সম্ভব সেই সহজ সত্যও ক্রমে মেনে নিচ্ছেন তাঁদের পৃষ্ঠপোষকরা। শুধু কি তাই? ১৮৩২ সনে সংবাদ—"বিনামূল্যে ঐ গ্রন্থ প্রাপ্তিমাত্র বাবুকে ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়রা আশীর্বাদ করিতেছেন"।[৪৫]

কী ধরনের বই ছাপা হতো তখন? উত্তরে বলা যায় সব ধরনের বই। লঙ সাহেব ১৮২০ সনে ছাপা বাংলা বইয়ের যে ফর্দ দিয়েছেন তাতে ১৯টি কাব্যগ্রন্থের নাম আছে। আর তার মধ্যে পাঁচখানাই

আদিরসাত্মক। যেমন—আদিরস, রতিমঞ্জরী, রতিবিলাস, রসমঞ্জরী ইত্যাদি।[৪৬] এমনকি ভবানীচরণ নিজেও হাত দিয়েছেন আদিরসাত্মক পুঁথি রচনায়। কেননা, পাঠকের দাবি। তাঁরা বলছেন—"মুদ্রাক্ষরে বহু গ্রন্থ প্রকাশ হইল॥/কিন্তু আদিরস কাব্য দেখিতে না পাই॥/যা দেখি ভারতকৃত নব্য কিছু নাই॥" অথচ—"এখন কতক নব্য নায়ক মজিয়া॥/করে কত রস নায়িকা লইয়া॥/সে রস বর্ণিলে ভাল গ্রন্থ এক হয়।/তাহারা কুকর্ম ত্যজে ইথে সুখোদয়।" আর সেই কথা শুনে—"সভাস্থ সকলে বলে তাঁহার নিকটে।/এই মত গ্রন্থ করা যুক্তিসিদ্ধ বটে।" সুতরাং রচিত হল (১৮২৫) "দূতীবিলাস"।[৪৭]

শুধু নানা ধরনের বই নয়, অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করছে ছাপাখানা। ১৮২৫ সনে ছাপা হয়েছে "মেপ অর্থাৎ নকশা"। শক সাহেবের নকশা। "বাংলা অক্ষরে এরূপ নকশা ইতিপূর্বে কখন হয় নাই এই হেতুক এই মেপের উপর এমন লিখিত আছে যে ভারতবর্ষের প্রথম বাংলা নকশা এই।" ১৮২৯ সনে আর এক চাঞ্চল্যকর খবর—"শুড়ায় পাতুরিয়া ছাপাখানা। এই পাষাণযন্ত্রের অধ্যক্ষ তাহাতে নানাবিধ গ্রন্থ ও নানা প্রকার প্রতিমূর্তি অর্থাৎ ছবি ছাপা করিবেন সম্প্রতি তিন কর্মারম্ভ হইয়াছে"।[৪৮]

বাংলা বইয়ে ছবি ছাপা অবশ্য শুরু হয়ে গেছে তার অনেক আগেই। গবেষকরা বলেন প্রথম সচিত্র বাংলা বই গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রকাশিত ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল"। ফেরিস কোম্পানির ছাপাখানায় বইটি ছেপেছিলেন তিনি। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল—"বর্ন্ন সুদ্ধ করিয়া উত্তম বাঙলা অক্ষরে ছাপা হইতেছে পুস্তকের প্রতি উপক্ষণে এক ২ প্রতিমূর্ত্তি থাকিবেক মূল্য ৪ টাকা...।" গঙ্গাকিশোরের বাড়ি নাকি শ্রীরামপুরের কাছে বহরা গ্রামে। শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় কিছুদিন কম্পোজিটারের কাজ করেছিলেন তিনি। তারপর কলকাতায় এসে প্রকাশক। অন্নদামঙ্গল সাহেবদের

প্রেসে ছাপবার পর নিজে ছাপাখানা করেন তিনি। সহযোগী ছিলেন জনৈক হরচন্দ্র রায়। সেখান থেকেই বের হয় তাঁর "বাঙগাল গেজেটি"। কলকাতায় তিনিই নাকি প্রথম বাঙালী পুস্তক বিক্রেতা। শেষ পর্যন্ত গঙ্গাকিশোর অবশ্য ফিরে যান বহরায়। তবে ছাপাখানা-সহ। গ্রামবাংলায় সেটাই সম্ভবত প্রথম ছাপার কল।[৪৯]

"অন্নদামঙ্গল"-এর ছবি এঁকেছিলেন শিল্পী রামচাঁদ রায়। আরও অনেক সচিত্র বাংলা বইয়ের সন্ধান দিয়ে গেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যথাঃ "গৌরীবিলাস" (১৮২৪)। শিল্পী—বিশ্বম্ভর আচার্য। "সঙ্গীত তরঙ্গ" (১৮১৮)। এর ছবিও রামচাঁদ রায়ের আঁকা। "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী" (১৮২৪)। ছবি এঁকেছেন—বিশ্বম্ভর আচার্য। "বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী" (১৮২৫)। চিত্রকর—মাধব দাস। এ ছাড়াও তালিকায় আছে "বত্রিশ সিংহাসন" (১৮২৪), "আনন্দলহরী" (১৮২৪), "অন্নদামঙ্গল" (১৮২৮), "হরিমঙ্গল গীত" ইত্যাদি। এই অন্নদামঙ্গলের ছবি এঁকেছেন এবং খোদাই করেছেন কয়েকজনে মিলে। তাঁদের মধ্যে আছেন—বীরচন্দ্র দত্ত, রূপচাঁদ আচার্য, রামধন স্বর্ণকার, রামসাগর চক্রবর্তী। "হরি-মঙ্গল"-এ রামধন স্বর্ণকারের হাতের কাজ রয়েছে ৭১ খানা ; সবই ধাতু-খোদাই। কাঠখোদাইয়ের নানা নমুনা আছে "গৌরীবিলাস" (১৮২৪), "কালী কৈবল্যদায়িনী" (১৮৩৬), "নূতন পঞ্জিকা" (১২৪২ বঙ্গাব্দ), "হরপার্বতী মঙ্গল" (১৮৫১) এবং "অন্নদা-মঙ্গল" (১৮৫৭) বইতে। শিল্পীরা সবাই স্বদেশী।[৫০] শুধু বইয়ের জন্য ছবি আঁকা এবং খোদাই নয়, পরবর্তীকালে ওঁদের কুশলতায় এককভাবে মুদ্রিত ছবিও রীতিমত দর্শনীয়। মস্ত মস্ত কাঠের ব্লকে সেসব ছবি ছাপানো হতো, রং করা হতো হাতে। বিদেশীদের সঙ্গে করণকৌশল এবং ডিজাইনের নিয়মিত লেনদের তখন আমাদের বাঙালীটোলায়। কালীঘাটের পটের মতোই বটতলার সেসব ব্লক-প্রিন্ট সমান উপভোগ্য আজও।[৫১] কে জানে তাঁদের উত্তরপুরুষদেরই

কেউ কেউ এখনও চিৎপুর-আহেরিটোলা অঞ্চলে ঠুকঠুক করে কাঠের হরফ আর কাঠের ব্লক তৈরি করে চলেছেন কি না। আজ আর কেউ ওঁদের নাম জানেন না,—এই যা।

"অন্নদামঙ্গল" যদি প্রথম সচিত্র বাংলা বই, তবে প্রথম সচিত্র বাংলা সাময়িকপত্র বোধ হয় "পশ্বাবলী"। তবে তার লেখক, চিত্রকর, মুদ্রাকর—সবাই বিদেশী। অনুবাদক ছিলেন কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশনের ডব্লিউ এইচ পিয়ার্স। চিত্রকর—জন লসন। মাসিক পত্র হিসাবে "পশ্বাবলী"র প্রথম প্রকাশ ১৮২২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে। "পশ্বাবলী"কে বলা যায় বিদ্যার্থীদের কাগজ।[৫২] স্বদেশী মানুষের হাতে প্রথম সত্যিকারের সচিত্র মাসিক পত্রিকা কিন্তু প্রকাশিত হয় বেশ কিছুকাল পরে, ১৮৫১ সনে। সেটি রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত "বিবিধার্থ-সংগ্রহ"। তার পাতায় ছাপা ছবিগুলো এখনও দেখবার মতো।[৫৩]

ছাপার মতো ছবির ব্লক তৈরিতেও উন্নতি হয়েছে ধাপে ধাপে। পরিবর্তন ঘটেছে যেমন অংকনশৈলীতে তেমনই করণ-প্রকরণে।[৫৪] কাঠখোদাই, ধাতু-খোদাই, লিথো ইত্যাদির পরে এক সময় হাফটোন ব্লক। হাফটোন ব্লক অবশ্য ব্যবহৃত হয় অনেক পরে। তবু এখানে তার কথা উল্লেখ করছি কারণ এই সাফল্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একজন বাঙালীর নাম। তিনি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।[৫৫]

শুধু কোনও মতে বই ছাপানো নয়, প্রথম থেকেই চেষ্টা চলছে ছাপা-বইকে সকলের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার। কেননা, ছাপাখানার হাতলটি যার হাতেই থাক প্রাণভোমরা পাঠকের হাতে। ছাপার হরফের অবশ্য বিশেষ উন্নতি সম্ভব হয়নি দীর্ঘকাল। সে পথে অসুবিধা অনেক। একজন অভিজ্ঞ মুদ্রাকরের মতে প্রথম অসুবিধা হরফ-সংখ্যা। লাতিনে সাকুল্যে অক্ষর-সংখ্যা ২৬টি। অথচ অধিকাংশ ভারতীয় ভাষায় যুক্তাক্ষর ইত্যাদি নিয়ে কমপক্ষে ৬০০ হরফ। হাতে সাজিয়ে বই ছাপাতে গেলে বাংলায় কমপক্ষে চাই

৩৭০টি হরফ। একটি ডবল-কেস বোঝাই রোমান হরফ হলে দিব্যি ইংরাজী বই ছাপা চলে, কিন্তু বাংলায় চাই সাত গুণ বেশি হরফ। ওজন করলে তার পরিমাণ দাঁড়াবে ২০০০ পাউন্ড। সুতরাং, কত খরচ হতে পারে সেটা অনুমেয়।[৫৬] তা ছাড়া হরফের আকার-প্রকারও রোমান থেকে অন্যরকম। বাংলা হরফও হাতের লেখা অনুসারী। কিন্তু সে-লেখার সংস্কার বা আরও সুন্দর, আরও ব্যবহারযোগ্য করার চেষ্টা পরবর্তীকালে খুব হল কই? সত্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিছু-কিছু হয়েছে, কিন্তু অগ্রগতি যৎসামান্য। লাইনো আর মোনো-টাইপে পেঁছেই কেমন যেন থেমে গেছি আমরা। হলহেডের বই ছাপা হয়েছিল যে হরফে তার আদর্শ ছিল নাকি হুগলি-নিবাসী জনৈক খুশমৎ মুন্সীর হস্তলিপি। পরে মিশনারীদের কাছে আদর্শ হস্তলিপি বলে গৃহীত হয় জনৈক কালীকুমার রায়ের হাতের লেখা। ১৮০৩ সনে কালীকুমার রায় ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হস্তলিপি শিক্ষক এবং সেরেস্তাদার। বাংলা ছাপার হরফে এখনও বোধ হয় রয়ে গেছে তাঁর স্বাক্ষর। কেননা, আজকের লাইনোটাইপের সঙ্গেও অনায়াসে আত্মীয়তা খুঁজে পাওয়া যায় ১৮২৮ সনে শ্রীরামপুরে ছাপা বাংলা হরফের।[৫৭] অবশ্য লন্ডনেও তখন প্রায় একই ধরনের হরফে ছাপা হচ্ছে বাংলা বই। "লন্দন রাজাধানিতে চাপা" ১৮২৫ সনের "তোতা-ইতিহাস" ১৮৩৩ সনের শ্রীরামপুরের "প্রবোধ চন্দ্রিকার" মতোই দর্শনীয়। লন্ডনে ওই বইটি ছেপেছিলেন —গ্রেট কুইন স্ট্রীটের "কক্স অ্যান্ড বেইলিস"। তার কিছুকাল পরে লন্ডনে দেখি বিক্রি হচ্ছে আরও ছোট আরও চিকন বাংলা পাইকা হরফ।[৫৮] তবে হরফে বিশেষ কিছু করতে না পারলেও অন্যান্য ব্যাপারে রীতিমতো উদ্যোগী সেদিনের ছাপাখানার পরিচালকরা।

শুধু সচিত্র বই প্রকাশ নয়, লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশকরা সেদিন সত্যই যাকে বলে উদ্যোগী-পুরুষ। অনেক সময় একাই তিনি

ত্রিমূর্তি। যিনি লেখক, তিনিই মুদ্রাকর, তিনিই প্রকাশক। অদম্য তাঁদের উৎসাহ, অবিশ্বাস্য তাঁদের ধৈর্য আর সংকল্পের দৃঢ়তা।[৫৯] নানা বিষয়ে বই লিখেছেন তাঁরা, ছেপেছেন, মুদ্রিত বই পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গ্রহণ করেছেন নানা পন্থা। এক বটতলার বেসাতির কথা ভাবলেও অবাক হয়ে যেতে হয় আজ। "সকল কারণ তুমি, তুমি সে কারণ'' ছাপতে বটতলার ছাপাখানার কর্মী হয়তো সত্যিই ছেপে বসেছিলেন ''কাবল কাবল ভূষি ভূষি সে কাবল'', কিন্তু তার জন্য হাসাহাসি করে লাভ নেই, ভুল মানুষেরই হয়।’ আর ছাপার ভুল? একালের এক সুরসিক লেখক তাঁর বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন—"পরিশেষে বক্তব্য সম্পূর্ণ নির্ভুল ছেপে আমাদের মুদ্রণ ঐতিহ্যকে আমি নষ্ট হতে দেইনি; এজন্য আমি নিজে খুশি আছি।''[৬০] সুতরাং কেমন ছাপতেন ওঁরা তার চেয়েও জরুরী কথা বটতলায় ওঁরা কী ছাপতেন? এখানে তার বিশদ আলোচনার সুযোগ নেই। শুধু এটুকু বললেই বোধ হয় যথেষ্ট, শহরের অন্যত্র যা ছাপা হতো বটতলার পসরাও ছিল তাই। তাঁরা আরও তাড়াতাড়ি জনতার কাছে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন—এই যা।[৬১]

ভারিক্কি প্রকাশকদেরও অবশ্য লক্ষ্য ছিল পড়ুয়ার হাতে বইটি কী করে তুলে দেওয়া যায় তা। বইয়ের সাজানো দোকান নেই তখন। অতএব কাগজে বিজ্ঞপ্তি ছাপানো হতো—"যে মহাশয়ের লইবার বাসনা হইবে তিনি মোং কলিকাতায় শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের আপিসে কিম্বা মোং শ্রীরামপুর কাছারি বাটীর নিকট শ্রীজান দেরোজারু সাহেবের বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।'' কিংবা "চারিশত বিক্রয় হইয়াছে একশত আছে ছয় তঙ্কা মূল্যে যাহার লইবার বাঞ্ছা হয় তবে মোং উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অথবা মোং কলিকাতায় শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায়ের সৈসোয়িটী আত্মীয় সভাতে চেষ্টা করিলে পাইবেন।'' বটতলায়ও অনেকটা একই স্টাইল।—"গ্রহন্ত গ্রাহককার যেজন হইবে/

বটতলা আসিয়া সেই তল্লাস করিবে। তিনশো পঁয়ত্রিশ নম্বর দোকান মাঝার/তালাস করিলে পাবে আবশ্বক জার...।” কিংবা “মধুরস কথা ভাই জানিবে তাহাতে/বান্ধা বটতলায় তারে দিয়াছি ছাপিতে...।”[৬২]

আজকাল অনেক সময় অগ্রিম গ্রাহক করে বই ছাপানো হয়। এটাও কিন্তু পুরানো কেতা। রামকমল সেনের সুখ্যাত অভিধান প্রকাশের সময় জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল—“ক্ষুদ্র অক্ষরে দুই বালুমে কমবেশী হজার পৃষ্ঠা হইবেক। যে-ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকেদের লইতে হইলে সত্তরি টাকা লাগিবেক।” আর এক ইস্তাহারে সোজাসুজি বলে দেওয়া হয়েছিল—“ছাপার ব্যয়ের সংস্থান হইলে উদ্যক্ত করিতে পারি।” আর এক প্রকাশক জানাচ্ছেন মনুর অনুবাদ করা হয়েছে। “কিন্তু গ্রাহকের অভাবে ভাষাকর্তা ছাপাইতে পারেন নাই।” তাঁর জিজ্ঞাসা—“যদি মনু জীবৎ থাকিতেন তবে তিনি ইহা শুনিলে কি বলিতেন?” পাঠককে আকর্ষণ করার জন্য অনেক সময় একই বই নানাভাবে পরিবেশন করা হতো। যেমন—“প্রতি পুস্তকের মূল্য জেলেদ সমেত লইলে ৪॥ সাড়ে চারি টাকা দিতে হইবেক। জেলেদ না লয়েন চারি টাকা দিলে পুস্তক পাইবেন।” দ্বিতীয়টি যাকে বলা হয়—পেপার-ব্যাক। আবার কাগজের হেরফেরের জন্যও দু'রকম দাম করা হতো কখনও কখনও। যেমন—“ইংরেজী কাগজে একশত টাকা ও পাটনাই কাগজে আশী টাকা।”[৬৩]

ভারি ভারি বই ছাপবার আগে প্রকাশকরা খাতা নিয়ে হানা দিতেন ধনী এবং বিদ্যোৎসাহীদের দুয়ারে,—সহি দিন। নিয়ম ছিল সই পেলে “পুস্তক প্রস্তুত হইলে তাঁহারদিগের নিকট প্রেরণ করিয়া টাকা লওয়া,”—আগে টাকা পরে বই নয়। উনিশ শতকে এই সহি আদায়ের জন্য নাকি খুবই তৎপরতা। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “কলিকাতা কমলালয়”-এ শহরে সদ্যাগত গ্রামের

সরল মানুষটি বলছেন—"কেহ বলেন এই ছাপাওয়ালাদিগের জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না সর্বদাই আইসে মহাশয় হিতোপদেশ পুঁথি হইতেছে সহি করুন কেহ বলে দায়ভাগার্থদীপিকা হইতেছে নাম সহি দিউন!" ইত্যাদি।

সবাই যে সই দিতেন এমন নয়। "কেহ বলেন কল্য আইসহ কিন্তু আমিও সেই পাত্র অদ্যাবধি এক অক্ষরও লই নাই যদি আমার কাছে আসে তবে কহি কল্য আসিবা অথবা রবিবারে, শর্মা সেই রবিবারে বাগানে প্রস্থান করেন তাহারা ঘুরে ব্যাড়ায়।" তবে অনেকে সই দিতেনও, কেননা, ইজ্জতের প্রশ্ন। ছাপাখানা আধুনিকতা। ছাপাখানা কালতিলক। ছাপানো বই ঘরে রাখা সত্যিকারের বাবুয়ানার লক্ষণ। ফলে গ্রামের আগন্তুক অবাক হয়ে শোনেন—"বাবু সকল নানা জাতীয় উত্তম ২ গ্রন্থ অর্থাৎ পার্সি ইংরাজী আরবি কেতাব ক্রয় করিয়া কেহ এক বা দুই গেলাসওয়ালা আলমারির মধ্যে সুন্দর শ্রেণীপূর্বক এমন সাজাইয়া রাখেন যে দোকানদারের বাপেও এমত সোনার হল করিয়া কেতাব সাজাইয়া রাখিতে পারিবে না।" শুধু কি তাই? তিনি শুনেছেন এই সব বইয়ে "জেলদ্‌গর ভিন্ন বাবু স্বয়ং কখনও হস্ত দেন নাই এবং কোনকালেও দিবেন এমন কথাও শোনা যায় না।"[৬৪]

স্পষ্টতই ব্যঙ্গ করা হচ্ছে বাবুকে। তবে একথা অস্বীকার করা যাচ্ছে না, পড়ুন বা না-পড়ুন বাবুরা বশ মেনেছেন ছাপার কলের কাছে। বই ছাড়া তাঁদের আর দিন চলছে না। ছাপাখানা ছাড়া এমনকি মনের কথাও খুলে বলা যাচ্ছে না পাঁচজনের কাছে। রামমোহন নতুন নতুন কেতাব ছাপিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছেন সতী-দাহের বিরুদ্ধে।[৬৫] পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতেও দেখি কলম এক তীক্ষ্ণ হাতিয়ার।[৬৬] ছাপাখানা শুধু বাংলা গদ্য, অন্য কথায় কাজের ভাষা ব্যবহার করতেই শেখায়নি আমাদের, নানা সং-কর্মের দীক্ষা এবং শিক্ষাও এই ছাপাখানার মারফতেই। শুধু

রামমোহন আর বিদ্যাসাগর কেন, ছাপাখানার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছেন উনিশ শতকের অনেক স্বনামধন্য বাঙালী। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও সম্ভব হয়নি নেপথ্যে বসে নিঃশব্দে কলম চালিয়ে যাওয়া। নিজেদের বইপত্র নিজেদের উদ্যোগে ছাপবার কথা ভাবতে হয়েছে তাঁদেরও।[৬৭] ছাপাখানাই সরস্বতীর মুক্তিদাতা, ছাপাখানাই গণতান্ত্রিক চেতনার প্রথম কথা। শুধু তাই নয়, সাদা কাগজে ছাপাখানার কালি মাখিয়েই একাল এসে দাঁড়িয়েছিল সেদিন আমাদের সামনে। কেউ কেউ তাকে চিনে নিতে ইতস্তত করেছেন হয়তো, কিন্তু চক্ষুষ্মান্‌রা তখনই জেনেছিলেন অন্ধকার এবার কাটলো বলে। ১৮১৯ সনের ২০ ফেব্রুয়ারি ''সমাচার-দর্পণ'' লিখছে—''এই দেশে পূর্বকালে কতক কতক লোকের ঘরে পুস্তক ছিল এবং অল্পলোক বিদ্যাভ্যাস করিত অন্য ২ সকল লোক অন্ধকারে থাকিত এখন এই দেশে ক্রমে ২ ছাপার পুস্তক প্রায় ছোট বড় ঘর-সকল ব্যাপ্ত হইতেছে গত দশ বৎসরের মধ্যে আন্দাজ দশ হাজার পুস্তক ছাপা হইয়াছে কিন্তু সকল পুস্তক এক স্থানে নাই নানা লোকের ঘরে বিলি হইয়াছে এবং যে-ব্যক্তি এক পুস্তক লইয়াছে তাহার অন্য পুস্তক লওনের ইচ্ছা জন্মে এইরূপে এদেশে বিদ্যা প্রচলিতা হইতেছে,'' ইত্যাদি। ১৮২৪ সনে একই কাগজ নতুন বইয়ের বিবরণ দিয়ে বলছে—''আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম যেহেতু এত পুস্তক ছাপা হইয়া সর্বত্র লোকেদের দৃষ্টি-গোচর হইতেছে।'' দর্পণ-সম্পাদক নিশ্চিত জানেন—''তদ্দ্বারা ক্রমে লোকেদের জ্ঞান ও সভ্যতা বৃদ্ধি হইবেক''।[৬৮]

ক্রমে এই সত্য মেনে নিলেন অন্যরাও। ১৮২৯ সনের ডিসেম্বরে কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার তালিকা ছেপে বাঙালীদের কাগজ ''বঙ্গদূত'' লিখেছেন—''এতদ্ভিন্ন ইংরাজীতে মাসিক ও ত্রৈমাসিক ও সাম্বৎসরিক অনেক প্রকার সংবাদ সংঘটিত পুস্তক ছাপা

হইয়া প্রতিনিয়ত প্রকাশ পায় এবং ক্ষুদ্র যন্ত্রালয়ে অনেকানেক গ্রন্থ ইংরাজি পারস্য ও দেবনাগর ও বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহার সংখ্যা লিখনাতিরিক্ত অতএব পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন যে এতদ্দেশে ছাপার যন্ত্র কি প্রকার বিস্তার হইয়াছে ও তদ্দ্বারা নানা দেশীয় সমাচার ও নানাবিধ গ্রন্থ রচনায় লোকের কীদৃক্ উপকার দর্শিতেছে।" ১৮৩৩ সনে শুনি "দশ বৎসরাবধি ভারতবর্ষে মুদ্রাঙ্কণ কার্যের অপূর্বরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং কলিকাতা নগরে ভূরি ভূরি ঐ যন্ত্রালয় হইয়াছে।" তার তিন বছর আগে ১৮৩০ সনে কাগজে সংবাদ—"ষষ্ঠ সংবাদপত্র। এক্ষণে বাংলাভাষায় পাঁচ সংবাদপত্র প্রকাশ পাইতেছে অপর এই সপ্তাহের চন্দ্রিকার দ্বারা আমরা অবগত হইলাম যে কলিকাতা শহরে অন্য এক বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ হইবেক।" এক একটি কাগজের নাম রীতিমত তাৎপর্যপূর্ণ। দর্পণ বা গেজেট নিয়েই খুশি নন প্রকাশকরা। তাঁদের কারও কাগজের নাম—"সমাচার চন্দ্রিকা", কারও বা "সম্বাদ তিমিরনাশক"। দর্পণে যদি আপনার মুখ আপনি দেখা, তিমিরনাশকের সংকল্প তবে দু'হাতে অন্ধকার মুছে ফেলা। "জ্ঞানোদয়", "জ্ঞানান্বেষণ" এসবও কাগজেরই নাম। সুতানুটি-গোবিন্দপুরের আকাশে তখন বলতে গেলে এক-সঙ্গে একাধিক চন্দ্রসূর্য। "সম্বাদ কৌমুদী", "সংবাদ সৌদামিনী", "পূর্ণচন্দ্রোদয়", "প্রভাকর", "দিবাকর", "অরুণোদয়"—আরও কত কী। শহরের একটি হিন্দী সাময়িকপত্রের নাম ছিল—"উদন্ত মার্ত্তণ্ড"। সকলেরই বাহন কিন্তু সেই যন্ত্র। একাই সে সপ্তাশ্ব। কলকাতার মন তারই টানা রথে সওয়ার তখন, পূবের আকাশ আলোয় আলোয় উজ্জ্বল।[৬১]

সেই আলোতে আপন মনকে আলোকিত করছেন নবযুগের বাঙালী বাবু। কখনও হাতে তাঁর মুদ্রিত বিদেশী বই, কখনও বা স্বদেশী পুঁথি। ছাত্র রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন—"Cyrus's Travels by Chevalier Ramsay পড়িয়া প্রচলিত হিন্দুধর্মে আমার বিশ্বাস

বিচলিত হয়। তৎপরে রামমোহন রায়ের Appeal to the Christian Public in favour of the precepts of Jesus এবং চ্যানিঙের (Channing) গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টীয়ান হই, তৎপরে ঈষৎ মুসলমান হই, পরিশেষে কলেজ ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্বে Hume পড়িয়া সংশয়বাদী হই।” মনে মনে কত কী কাণ্ডই না ঘটাচ্ছে তখন ছাপাখানা।

ছাপাখানার সঙ্গে বাংলাদেশের পরিচয় যদিও এদেশেরই কোনও কোনও এলাকার চেয়ে বেশ দেরিতে, তবু অচিরেই দেখা গেল পবনের বেগে সবাইকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলা। শতকের মাঝামাঝি বলতে গেলে কলকাতার মতো কাগজ-ভুক্ শহর ভারতে আর দ্বিতীয়টি নেই। ১৮৮৫-৮৬ সনের, অর্থাৎ জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম-বছরের একটা সরকারী খতিয়ান দেখছিলাম। সে-বছর তামাম ভারতে ছাপাখানা ছিল ১,০৯৪টি। উত্তর পশ্চিম এবং উত্তর ভারতে ২৯৪টি, মাদ্রাজ ওরফে দক্ষিণ ভারতে ২০০টি, বোম্বাই বা পশ্চিম ভারতে ২২৮টি, পাঞ্জাবে ৭৯টি, মধ্যপ্রদেশে ১৬টি, আসামে ৪টি, ব্রহ্মদেশে ২৬টি, ইত্যাদি। বাংলায় তখন সচল ছাপাখানা ২২৯টি। সে বছর এই দেশে তখন ইংরাজী কাগজ ছাপা হচ্ছে ১২৭টি, দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রের সংখ্যা ২৭৭টি। তার ওপর সাময়িক পত্র তো আছেই। কাগজ ছাড়া বইও ছাপা হয়েছে বিস্তর। সরকারী খাতায় যোগফল—৭৯৯৯ খানা। তার সিংহভাগও বাংলার। বোম্বাই ছেপে থাকে যদি ১৮৫৫টি বই, মাদ্রাজ ৭১৮টি, বাংলা তবে ছেপেছে ২৪১৪টি বই। অথচ বাংলা ভাষায় বই ছাপা শুরু বলতে গেলে তার মাত্র একশ বছর আগে। কড়াকড়িভাবে গুনলে একশ সাত বছর![৭০]

সন্দেহ কী, “ছাপার পুস্তকের গমন স্রোতের ন্যায়”। কলকাতায় ছাপাখানার আদিযুগে “সমাচার-দর্পণ” লিখেছিল—“যেমন ক্ষুদ্র নদী নির্গতা হইয়া সর্বদেশে ব্যাপ্তা হইয়া সেই দেশকে উর্বরা করে সেই মত ছাপার পুস্তক ক্রমে ক্রমে সর্ব দেশে ব্যাপ্তা হইয়া সকল

লোকের বোধগম্য হওয়াতে তাহাদের মন উচ্চাভিলাষি করে পূর্বকালে বর্ধিষ্ণু লোকের ঘরেতেও তালপত্রে অক্ষর মিলা ভার ছিল ছাপার আরম্ভ হওয়া অবধি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকের ঘরেতেও অধিক পুস্তক সঞ্চার হইয়াছে।" আপন পল্লীতে ছাপাখানার আবির্ভাব এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকের জীবনে এক বিশাল ঘটনা। সভ্যতায় চাকা আবিষ্কারের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছাপার বিদ্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠা। সাধারণের জীবনে তুলনাহীন এই "যন্ত্র"। কেননা, মূককে সে বাচাল করেছে, পঙ্গুকে শিখিয়েছে গিরি অতিক্রম করতে। তার দৌলতেই রাজার ঘরে যে-ধন আছে বা থাকা সম্ভব টুনির ঘরেও সে-ধন থাকতে পারে। তারই কারসাজিতে কখনও বা নাক কাটা যায় স্বয়ং রাজাবাহাদুরের।

প্রাসঙ্গিক
আরও
কিছু
খবরাখবর

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত **সংবাদপত্রে সেকালের কথা,** প্রথম খন্ড, ১৩৫৬, দ্রষ্টব্য।

২। নামাবলী, গোপীছাপ ইত্যাদিও একধরনের ছাপার কাজ। বাংলা-মুলুকে তার ব্যাপক চল ছিল ষোড়শ সপ্তদশ শতকেও। দীনেশচন্দ্র সেন মশাই লিখেছেন তিনি কাঠের ব্লক ছাপা পুরানো বইও দেখেছেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বীকার করেছেন সেটা নিতান্তই বিচ্ছিন্ন ঘটনা। তাঁর কথা :

"We have come accross a Ms. nearly 200 hundred years old, which was printed from engraved wooden blocks. But the art was not in general use ; a stray endeavour for decorative purposes does not prognosticate a system or a regular cultivation of the art, so we may rightly pass over it."—*History of Bengali Language and Literature* (New Ed.), 1954.

৩। "নববার্ষিকী গ্রন্থের লিখিত বাঙ্গালার খ্যাতিমান ব্যক্তিগণ", **বঙ্গদর্শন**, আশ্বিন, ১২৮৪। এটি একটি পুস্তক-সমালোচনা মাত্র। **নববার্ষিকী** শ্রীবিপিনবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ছাপা হয়েছিল ভিক্টোরিয়া যন্ত্রে।

৪। ১৮০৩ সনে আগ্রা দুর্গের পতনের পর লর্ড লকের নেতৃত্বে ব্রিটিশবাহিনী দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করে। শুরু হয় লুটপাট। সন্ধ্যায় লেঃ ম্যাথুস ভেতরে ঢুকলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল অদ্ভুতদর্শন একটি যন্ত্র। দেখতে অনেকটা ইউরোপীয় ইস্ত্রি করার যন্ত্রের মতো। কাছে গিয়ে তিনি সেটিকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন। বোঝা গেল যন্ত্রটি আসলে একটি ছাপার কল। প্রাচ্যদেশীয় হরফে কিছু ছাপার জন্য টাইপ পর্যন্ত সাজানো। এমন সময় বেঙ্গল আর্মির মেজর ইয়ুল এসে হাজির হলেন সেখানে। কী ছাপা হচ্ছিল দেখবার জন্য

তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কেননা, ও'দের মনে হলো তামাম ভারতে এটাই ছাপার প্রথম উদ্যোগ। তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য ঘটনা—রাজকীয় উদ্যোগ। একটা প্রুফ টানা হলো। দেখা গেল ও'রা ছাপতে চাইছিলেন পবিত্র কোরানের ছয়টি পৃষ্ঠা। টাইপ চমৎকার। দুঃখের বিষয় ছাপাখানা এবং হরফ কিছুই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। উদ্দাম উন্মত্ত সৈন্যরা সব ভেঙেচুরে একাকার করে দেয়।

এ-কাহিনীটি শুনিয়েছেন W. H. Carey, তাঁর *The Good old Days of Honorable John Company*, 1909, Vol-I-এ। তিনি এই বিবরণটি সংগ্রহ করেছেন ১৮৬১ সনে প্রকাশিত **"এশিয়াটিক জার্নাল"** থেকে। এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা আছে *Proceedings of the Bengal Asiatic Society,* May, 1861-এ।

৫। তথাকথিত শিবাজীর ছাপাখানা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য :

The Printing Press in India,—A. K. Priolkar, 1958

৬। ভারতে মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্য :

Introduction of European Printing into the East—Richard Garnett, *Trans. and proc. of the second International Library conf.*, London, 1898 ; *The first printing-presses* in *India,*—Leo Proserpio, *The New Review,* Vol-2, July—Dec, 1935 ; *Book in India*—K. M. Munshi, *Proc. of the 5th All India Library Congress,* Bombay, 1942 ; *Carey Exhibition of Early Printing and Fine Printing,* National Library, Calcutta, 1955 ; *The Printing Press in India,*—A. K. Priolkar, Bombay, 1958 ; **বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা**—মুহম্মদ সিদ্দিক খান, ১৩৭১ ; **বইয়ের কাহিনী**—রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, নতুন লেখা, বলাকা গ্রন্থমালা, ১ম সংখ্যা, ১৩৬১ ; **পুরানো বই**—নিখিল সেন, ১৩৬৪ ; **বিশ্বকোষ**—নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত, ১৩১১, (পঞ্চদশ ভাগ) ; **মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র**, নববার্ষিকী, ১২৮৪ ; **ছাপাখানা,**—পঞ্চপুষ্প, ১৫শ বর্ষ ; **বাংলা ছাপার হরফ**—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগান্তর, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৭।

৭। *Typographia*—John Johnson, 1824; *Five hundred years of Printing*—S. H. Steinberg, New Ed., 1974; *The Book: The Story of Printing and Bookmaking*—Douglas C. McMurtrie, 1957; *Caxton and Early Printers*—Sylvie Nickels, Jackdaw, 1968; *Printing and the Mind of Man,—Catalogue of the Exhibitions at the British Museum and at Earls Court,* London, 1963; *Monthly Courier,* UNESCO, Dec, 1972.

৮। হলহেড-এর ব্যাকরণ নিয়ে সুশীলকুমার দে, সজনীকান্ত দাস, প্রমুখ অনেকেই বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ব্যাকরণ হিসাবে এর বৈশিষ্ট্য কী, গুরুত্ব কোথায়, বাংলা সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীরা তা জানেন। বইটি কিন্তু দৃশ্যতও অতি মনোহর। নামপত্র থেকে শুরু করে শেষে সংযোজিত দ্বিতীয় একটি শুদ্ধিপত্র—সবই দেখবার মতো। বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৬। শেষ দিকে প্লেটে ছাপা একটি বাংলা চিঠি এবং অন্য হরফে তার একটি অনুলিপি ছাপা হয়েছে। ভূমিকা দখল করেছে ৩০ পৃষ্ঠা। অন্যত্র, সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বাংলা বর্ণ, শব্দ, বাক্য। ব্যাকরণের আলোচনা ছাড়াও এতে আছে সংখ্যা গণনা, মুদ্রা, ওজন, ইত্যাদি হরেক বিষয়। এমনকি বাংলা ছন্দ নিয়েও কিছু কথাবার্তা আছে। রামায়ণ, মহাভারত, বিদ্যাসুন্দর, পাঁচালি ছাড়াও আছে একটি বাংলা গান। নামপত্রেই একটি সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে হলহেড বলেছিলেন—"ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং"—ফিরিঙ্গিদের উপকারের জন্য লিখিত। সঠিক কবে ছাপা হয়েছিল এই ঐতিহাসিক বই তারও ইঙ্গিত রয়েছে এর পাতায়। বই যাঁরা বাঁধান তাঁদের প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে: "It is recommended not to bind the book till the setting in of the dry season, as the greatest part has been printed during the rains." বইয়ের শেষে বাংলা চিঠিতে তারিখ—সন ১১৮৫ সাল, ১১ই শ্রাবণ। সুতরাং, বইটি ১৭৭৮ সনের জুলাই-আগস্টে ছাপা হয়েছিল এটা ধরে নেওয়া যায়। বাংলা হিসাবে আষাঢ়-শ্রাবণে।

৯। বাংলা ভাষা এবং লিপির বিবর্তনের কাহিনীর জন্য দ্রষ্টব্য:
Linguistic Survey of India (vol-v), 1903, G. A. Griarson;

The Origin and Development of the Bengali Language, —S. K. Chatterjee Vol—I, Appendix—E, New Ed., 1970; *The Origin of the Bengali Script*—R. D. Banerjee, New Ed., 1973; **বঙ্গভাষা ও সাহিত্য**—দীনেশচন্দ্র সেন, নতুন সং, ১৩৫৩; **বাঙ্গালার পুরাণ অক্ষর**—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩২৭; **বাংলার বেখাপ বর্ণমালা**—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ("সবুজপত্র" থেকে সুশীল রায় সম্পাদিত **বঙ্গপ্রসঙ্গ** (১৩৭২) বইতে পুনর্মুদ্রিত); **বাংলা লিপি বা বাংলা অক্ষর**—নন্দলাল দে, সুবর্ণ বণিক সমাচার, ২য় বর্ষ; **বাংলা অক্ষর বানান ও ভাষা সংস্কার**—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাহে নাও, ঢাকা, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৫৯।

১০। রোমান হরফে বিদেশে ছাপা এই পাঁচখানা বাংলা বইয়ের মধ্যে এ পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া গেছে তিনখানার। তিনটিই বাংলা হরফে ছাপা হয়েছে এবং তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনাও হয়েছে। এ-সম্পর্কে প্রথম বাঙালী পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ভূতপূর্ব একজন প্রিন্সিপ্যাল ফাদার হস্টেন। দ্রষ্টব্য: *The Three first Type-printed Bengali Books*—H. Hosten, *Bengal Past and Present*, Vol—IX, July—Dec, 1914, এবং Vol—XIII, July—Sept, 1916. বাংলা হরফে পুনর্মুদ্রিত তিনটি বই—পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্সুম্পসাঁও রচিত **বাঙ্গালা ব্যাকরণ**—সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩১; **ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ**—সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৭; **কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ**—সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—১২, ১৩৪৬।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রোমান হরফে বাংলা বই পরবর্তীকালেও কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক ছাপা হয়েছে। জন গিলখ্রীস্ট-এর **দি ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট**-এ (১৮০৩) ইংরাজী ছাড়া বাংলা সমেত আরও ছয়টি ভাষা ছিল। সবই ছাপা হয়েছিল রোমান হরফে। **সংবাদপত্রে সেকালের কথায়** (দুই খণ্ডে) এ-জাতীয় বইয়ের কিছু বিজ্ঞাপন আছে। ১৮৩৪ সনের ১ নভেম্বরের সমাচার দর্পণ থেকে উদ্ধৃত একটি সংবাদে

বলা হয়েছে—"শোভাবাজারস্থ রোমানেজিং অর্থাৎ রোমান অক্ষরে মুদ্রণার্থ প্রেসে অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে যে ক্ষুদ্র আশ্চর্য এক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার এক পুস্তক আমরা পাইয়াছি।...শ্রীযুত ত্রিবিলিয়ন সাহেবের নিয়মক্রমে এবং তাঁহার আনুকূল্যে এই গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে।"...১৮৩৫ সনেও একটি বিজ্ঞাপনে রয়েছে "রোমানেজিং"-এর কথা। সুতরাং, বলা চলে—লিসবনের ধারা পরবর্তীকালে কলকাতায়ও একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। এক সময় রোমান হরফে বাংলা বই ছাপানো নিয়ে আলোচনাও চলেছে বিস্তর। ১৮৫৯ সনে লঙ সাহেব বলেন—যদিও ১৮৩৩ সন থেকে রোমান হরফে বাংলা ছাপা নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলছে এবং যদিও ১৮৩৭ সনে বেশ কয়েকটি বাংলা বই রোমান হরফে ছাপানো হয়েছিল, তবু বলা যায় উদ্যোগ ব্যর্থ। ডাফকে উদ্ধৃত করেছেন তিনি—রোমান হরফে ছাপা অনেক বই বিতরণ করা হয়েছে বটে, তবে মনে রাখতে হবে এদেশের মানুষ কাগজের লোভে চীনাভাষার বই পেলেও হাত বাড়িয়ে নেবে।

১১। উইলিয়াম বোলটস : ডাচ ভাগ্যান্বেষী বোলটস এক সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী হিসাবে এদেশে ছিলেন। বোর্ড অব ডাইরেকটারদের বিরাগভাজন হয়ে ১৭৬৭ সনে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইনিই *Considerations on Indian Affairs* (1772) নামক সেকালের একটি বহু-আলোচিত বইয়ের লেখক। হিকির গেজেটের চৌদ্দ বছর আগে ১৭৬৬ সনে তিনিই প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন কলকাতা থেকে একটি খবরের কাগজ প্রকাশ করতে। কলকাতার কাউন্সিল হাউসের দরজায় সাঁটা তাঁর সেই বিজ্ঞপ্তিটি ভারতের সংবাদ-পত্রের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দলিল। হাতে লেখা বিজ্ঞপ্তিটিতে এক জায়গায় বলা হয়েছিল : "...he (Mr. Bolts) is ready to give the best encouragement to any person or persons who are versed in the business of printing, to manage a press, the types and utensils of which he can produce..." মার্গারিটা বার্নস তাঁর ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে বোল্টস সাহেবের সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি উদ্ধৃত করেছেন। পড়লে মেনে নিতে হয় কলকাতায় প্রথম

ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল এই অভিযাত্রীর। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বাদ সাধলেন। বোল্‌টসকে ভারত ছাড়তে হল তাঁদের নির্দেশে।

বোল্‌টস সাহেব বিলাতে গিয়ে যে বাংলা হরফ তৈরি করাবার চেষ্টা করেছিলেন তার নানা প্রমাণ রয়েছে। বাংলা হরফ তৈরির ব্যাপারে চার্লস উইলকিনস-এর কৃতিত্বের কথা আলোচনা করতে গিয়ে হলহেড তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় প্রসঙ্গত স্মরণ করেছেন উইলিয়াম বোল্‌টসকেও। তিনি লিখেছেন :

"Mr. Bolts (who is supposed to be well versed in this language) attempted to fabricate a set of types for it, with the assistance of the ablest artist in London. But as he has egregiously failed in executing even the easiest part, or primary alphabet, of which he has published a specimen, there is no reason to suppose that his project when completed, would have advanced beyond the usual state of imperfection to which new inventions are constantly exposed." ব্যর্থ হলেও বোল্‌টস-এর এই প্রয়াস বাংলা-হরফের কাহিনীতে নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। উইলিয়াম বোল্‌টস লণ্ডনে বাংলা ছাপার হরফ তৈরি করবার জন্য শরণ নিয়েছিলেন জোসেফ জ্যাকসনের। জ্যাকসন-এর শিক্ষানবিশী জীবন কেটেছে বিখ্যাত ক্যাসলনের ঢালাই-খানায়। তাঁর কারখানার ১৭৭৩ সনের একটি হরফ-তালিকায় অন্য হরফের সঙ্গে "মডার্ন স্যাংস্কৃট" বা বাংলা হরফেরও উল্লেখ আছে। উইলিয়াম বোল্‌টস-এর অনুরোধেই যে জ্যাকসন এ-কাজে হাত লাগিয়েছিলেন সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্ণমালার চেয়ে বেশি দূর এগোতে পারেন নি ওঁরা। এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছেন মুহম্মদ সিদ্দিক খান তাঁর **বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথায়।** প্রাসঙ্গিক আরও খবরাখবরের জন্য উৎসাহী পাঠক Talbot Bains Reed-এর *History of the old English Letter Foundries etc.*, New Ed., 1952, উলটে দেখতে পারেন।

১২। হুগলিতে হলহেডের ব্যাকরণ ছাপা হওয়ার আগে বাংলা লিপির

যে আটটি মুদ্রিত নমুনার কথা বলা হয়েছে সেগুলোর বিস্তারিত নির্দেশিকা :

1667 : *China monumentis, qua sacris qua profanis nee non varüs naturae & artis spectaculis.* etc. etc. —Athansü Kircheri, Amstelodami, 1667.

1692 : *Observations Physiques et Mathematiques pour servir a Phistorie naturelle, et a la perfection de l' Astronomie et de la Geographie : Envoyees des Indes et de la* Chine etc. etc.—Jesuit Fathers Jean de Fontenay, Guy Tachard, Etienue Nod, Claude de Beze, Paris, 1692.

1725 : Aurenk Szeb—Georg Jackob Kehr, Leipzig, 1725.

1743 : *Dissertation Selectae Varia S. Lillerarum at antiquitations Orientalis Capita. . . illustrates Curis Secundis. . . Miscellanies Orientalibus acutae.* etc.—Davidius Millius, Leyden, 1743.

1748 : *Orientalisch-und-Occidentalischer, Sprachmeister,*—Johann Friedrich Fritz, Leipzig, 1748.

1773 : Specimen of 'Modern Sanskrit' was published in London by Joseph Jackson under the direction of William Bolts.

1776 : *A Code of Gentoo Law*—N. B. Halhed, London, 1776.

1777 : *Ayeen-I-Akbery*—Francis Gladwin, London, 1777.

এ ছাড়াও বাংলা হস্তলিপির নমুনা রয়েছে এডমন্ড ফ্রাই-এর (Edmond Fry) বিখ্যাত "প্যানটোগ্রাফিয়া" (*Pantographia*) নামক বইটিতে। বইটি প্রকাশিত হয় ১৭৯৯ সনে। সে-কারণেই এই তালিকা

থেকে বাদ দেওয়া হল। তবে ফ্রাই জানিয়েছেন এ-নমুনা তিনি সংগ্রহ করেছেন একটি ফরাসী এনসাইক্লোপেডিয়া থেকে। হতে পারে সেটি হলহেড-এর ব্যাকরণের আগে প্রকাশিত। সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এ-তালিকা ঈষৎ দীর্ঘ হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত গ্ল্যাডউইন সম্পর্কে কয়েকটি কথা। আগেই বলা হয়েছে গ্ল্যাডউইনের আইন-ই-আকবরীর শেষে অন্য একটি বইয়ের বিজ্ঞপ্তিতে ছাপানো হয়েছে বাংলা লিপির নমুনা। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে যে কয়জন ইংরাজ ভারতীয় ভাষা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন তাঁদের অগ্রগণ্য। সজনীকান্ত দাস তাঁর **বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস**-এ (নতুন সংস্করণ) তাঁর ওই বিজ্ঞাপিত শব্দকোষটি সম্পর্কে লিখেছিলেন—"গ্ল্যাডউইনের শব্দকোষ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মালদহ হইতে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা সম্পর্কে এই সর্বপ্রথম একজন ইংরাজের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল।"

১৭৮৩ সনের ১ অক্টোবর জর্জ পেরী নামক কোম্পানির একজন কর্মচারী কলকাতা থেকে লন্ডনে মিঃ নিকলস্ নামে একজন মুদ্রাকরকে একটি চিঠিতে গ্ল্যাডউইনের আইন-ই-আকবরী সম্পর্কে জানাচ্ছেন :

"Soon after my arrival here, in 1782, I had the pleasure of seeing our old school fellow Gladwin, whom I found busily engaged in his translation of the 'Ayeen-I-Akbery' or the Institutions of the Emperor Akbar, of which he has published a specimen in London, in 4 to. 1777 ; printed by W. Richardson. The work complete is now in the press of Mr. Wilkins here . . . etc."

লন্ডনে প্রকাশিত আইন-ই-আকবরী'র ওই নমুনা-খন্ডটিতেই রয়েছে বাংলা লিপির নমুনা।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই গ্ল্যাডউইন সাহেবের ছাপাখানা থেকেই ১৭৮৪ সনে যাত্রা শুরু হয়েছিল বিখ্যাত "ক্যালকাটা গেজেট"-এর। প্যারীর চিঠিখানা ছাপা হয়েছিল *A Biographical Dictionary of the Living Authors* -এ। লন্ডন থেকে সেটি প্রকাশিত হয় ১৮১৬ সনে।

১৩। প্রথম বাংলা হরফ যেখানে ছাপা হয়েছিল হুগলির সেই ছাপাখানাটি সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। শুধু এইটুকুই বলা হয়েছে তিনি বই-বিক্রেতা অ্যানড্রুস,—"মিঃ অ্যানড্রুস, এ বুক সেলার।" সম্ভবত এ খবরটা প্রথম প্রকাশ করেন মার্সম্যান (জে. সি.) তাঁর শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাসে। কাছাকাছি সময়ে কলকাতায় অ্যানড্রুস নামে একজন বই-বিক্রেতা কিন্তু সত্যিই ছিলেন। ১৭৮৪ সনের ৭ অক্টোবর **ক্যালকাটা গেজেট**-এ তাঁর "লাইব্রেরি"র বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল। নভেম্বর-ডিসেম্বরেও আবার বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তিনি। বিলাত থেকে আমদানি-করা বইয়ের দীর্ঘ তালিকা দেখে মনে হয় অ্যানড্রুস সাহেবের "লাইব্রেরি" তখন কলকাতায় জমজমাটি বইয়ের দোকান। কিন্তু হুগলির সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক? হুগলিতেও যে তাঁর ব্যবসা কিছু থাকতে পারে সে-সম্পর্কে ইঙ্গিত আছে ১৭৯৯ সনের ২৬ সেপটেমবর-এ **ক্যালকাটা গেজেট**-এ প্রকাশিত আর একটি বিজ্ঞাপনে। তাতে দেখা যায় বিজ্ঞাপনদাতা এ. অ্যানড্রুস (A. Andrews) জানাচ্ছেন হুগলির এফ. অ্যানড্রুস-এর (F. Andrews) বাড়ি থেকে একটি চার বছরের ছেলে হারিয়ে গেছে। কেউ সন্ধান দিতে পারলে তিনি দু'শ টাকা পুরস্কার দেবেন। ছেলেটির বাবার নাম মিঃ রিচার্ড ওকস। ৫ সেপটেমবর-এ তিনি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন—ছেলেকে নিয়ে তিনি হুগলির জন অ্যানড্রুস-এর (John Andrews) বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানেই ওই কান্ড। এতে আমরা একসঙ্গে তিনজন অ্যানড্রুস-এর নাম পেলাম বটে, কিন্তু ছাপাখানার কোনও সন্ধান পেলাম না। তবে এটুকু বোঝা গেল বইওয়ালা অ্যানড্রুস-এর নিজের অথবা তাঁর আপনজনদের সঙ্গে হুগলির সম্পর্ক ছিল। অ্যানড্রুস-সংক্রান্ত এই সব বিজ্ঞাপন দেখা যাবে—W. S. Seton-Karr সম্পাদিত *Selections from Calcutta Gazettes,* Vol—I, 1864, & Vol—III, 1868,-এ।

১৪। **এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ**-এর বিখ্যাত লেখক ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেড (১৭৫১—১৮৩০) অক্সফোর্ডশায়ার-এর এক বনেদী ঘরের সন্তান। লেখাপড়া—হ্যারো এবং অক্সফোর্ড-এ। ছাত্রজীবনে শেরিডনের বন্ধু ছিলেন তিনি। কৃতী ছাত্র হলেও হলহেড নাকি ব্যর্থ প্রেমিক। লিনলে নামে একটি তরুণী প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাঁকে।

হলহেড পালিয়ে এসেছিলেন ভারতে। বিয়ে করেছিলেন এদেশেই, চুঁচুড়ার ডাচ গভর্নরের কন্যা হেলেনা রিবাউটকে। তবে প্রায় দেড় ডজন বইয়ের রচয়িতা হলহেড-এর সত্যিকারের দ্বিতীয় প্রেম বোধ হয় এদেশের ভাষা এবং সংস্কৃতি। "জেণ্টু ল" ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন তিনি এদেশের পণ্ডিতদের সাহায্যে। এজন্য এগারো জন পণ্ডিত নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁরা প্রত্যেকে দৈনিক একটাকা হারে মাইনে পেতেন। অনুবাদ এবং ছাপা শেষ করতে সময় লেগেছিল তিন বছর। হলহেড বাংলা ছাড়াও আরও কোনও কোনও ভারতীয় ভাষা জানতেন। বাংলা ভাষার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে যে ক্রমে তিনি নাকি বলতে, গেলে বাঙালী-প্রায়। এমন অনর্গল বাংলা বলতে পারতেন যে, বাঙালীর আসরে বাঙালীর পোশাক পরে হলহেড যখন ভিড়ে মিশে যেতেন তখন নাকি তাঁকে চেনা ভার। সুশীলকুমার দে মশাই মনে করেন—এসব খবর বোধ হয় সত্য নয়। গুজবের উৎস রেঃ লঙ এবং ডবলিউ. এইচ. কেরী। আসলে এ-জাতীয় কাণ্ড করতেন দেওয়ানি আদালতের বিচারপতি ন্যাথানিয়েল জন হলহেড। জন হলহেড ব্যাকরণ-লেখকের ভাইপো অথবা ভাগ্নে। বর্ধমানে যাত্রার আসরে বাঙালী-বেশে বাঙালীর ভূমিকায়ও নাকি দেখা গেছে তাঁকে।

হলহেড দেশে ফিরে যান ১৭৮৫ সনে। তারপর পার্লামেণ্ট, রাজনীতি, ইণ্ডিয়া অফিসে চাকুরি ইত্যাদি।

উৎসাহী পাঠক হলহেড-এর জীবনীর জন্য সুশীলকুমার দে'র *Bengali Literature in the Nineteenth Century*, New Ed., 1962, ছাড়াও *Dictionary of National Biography*, Vol—III, দেখতে পারেন।

১৫। চার্লস উইলকিনস (১৭৫০—১৮৩৬) এদেশে আসেন ১৭৭০ সনে, কুড়ি বছর বয়সে। বন্ধু হলহেড-এর দৃষ্টান্ত দেখে তিনিও ভারতীয় ভাষা শিক্ষায় উৎসাহিত হন। সংস্কৃত এবং ফার্সি শেখেন। বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন উইলকিনস। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ (১৭৮৫) এবং একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ (১৮০৬)। বাংলা হরফে প্রথম বইটি ছাপানোর কাজে গৌরবময় ভূমিকায় অবতীর্ণ তিনি। তাছাড়া কলকাতায় তাঁর আর এক

কীর্তি এশিয়াটিক সোসাইটি। এই বিদ্বৎসভার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। শারীরিক কারণে উইলকিনস ভারত ত্যাগ করেন ১৮৩৬ সনে। তার পরও কিন্তু সমান তালে চলেছে তাঁর ভারতীয় ভাষাচর্চা এবং হরফ তৈরির চেষ্টা। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি এবং হেলিবেরির (Haileybury) কোম্পানির কলেজের (১৮০৫) সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তাঁর। প্রথমটিতে তিনি ছিলেন গ্রন্থাগারিক, দ্বিতীয়টিতে—"প্রাচ্য বিভাগের দর্শক" বা পরীক্ষক।

হলহেড তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় উইলকিনস-এর কৃতিত্ব সম্পর্কে লিখেছেন :

"The public curiosity must be strongly attracted by the beautiful characters which are displayed in the following work and although my attempt may be deemed incomplete or unworthy of notice, the book itself will always bear an intrinsic value, from its containing as extraordinary an instance of mechanic abilities as have perhaps ever appeared. That the Bengal Letter is very difficult to be imitated in steel will readily be allowed by every person who shall examine the intricacies of the strokes, the unequal length and size of the characters, and the veriety of their positions and combinations. It was no easy task to procure a writer accurate enough to prepare an alphabet of a similar and proportionate body throughout, and with that symmetrical exactness which is necessary to the regularity and neatness of the fount. . .

"The advice and even solicitation of the Governor General prevailed upon Mr. Wilkins, a gentleman who has been some years in the Indian Company's Civil Service in Bengal, to undertake a set of Bengal types. He did, and his success has exceeded every expectation. In a country so remote from all connexion with European artists, he has

been obliged to charge himself with all the various occupations of the Metallurgist, the Engraver, the Founder and the Printer. To the merit of invention he was compelled to add the application of personal labour. . ." ইত্যাদি।

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে বাংলা-হরফ তৈরির কাজে সমস্যা কী এবং কীভাবে তার সমাধান করা হয়েছিল সে-কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত। হলহেড এবং উইলকিনস দু'জনই তখন হুগলিতে। লেখকের চোখের সামনেই হরফ-নির্মাতার কাণ্ডকারখানা। সেদিক থেকে ব্যাকরণের ভূমিকার এই অংশটি বাংলা ছাপাখানার ইতিহাসে খুবই মূল্যবান।[১]

উইলকিনস কিন্তু সেখানেই থেমে যাননি। **বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস**-এ সজনীকান্ত দাস লিখেছেন—"তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য নাগরী হরফও প্রস্তুত করিয়াছিলেন ; এই সময়ে তিনি যে ফার্সী হরফও তৈরি করেন তাহা অনেক পরে ছাপার কাজে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উইলকিনসকে ভারতের ক্যাক্সটন বলিলে অন্যায় হইবে না।" এই তথ্যের সূত্র সম্ভবত "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" (জুলাই, ১৮১৮)। ওঁরা লিখেছেন—"To this fount of Bengalee types, he added others in the Nagree and Persian characters ; and thus completely opened the way for the ultimate diffusion of Knowledge throughout India."

অনুমান করতে অসুবিধা নেই উইলকিনস এসব কাজ করেছেন হুগলিতে নয়, কলকাতায়। হুগলিতে ব্যাকরণ ছাপা হওয়ার ক'মাসের মধ্যেই শুরু হয়েছিল কলকাতায় সরকারী উদ্যোগে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার তোড়জোড়। সেটি গড়ে তোলার দায়িত্বও গ্রহণ করেছিলেন উইলকিনস। সরকারের সচিব হজসন সাহেবের লেখা একটা সার্কুলার উদ্ধৃত করেছেন সজনীকান্ত দাস। তাতে তিনি সব বিভাগকে জানিয়ে দিচ্ছেন—সরকার ছাপাখানা বসাচ্ছেন, তোমরা সেখান থেকে কাগজপত্র ছাপাতে পার। খরচ কী পড়বে তাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে চিঠিটিতে। তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ খবর—ছাপাখানা তত্ত্বাবধান করছেন মিঃ চার্লস উইলকিনস। এই ছাপাখানা থেকে প্রথম বাংলা বই (ডানকানের 'ইম্পে-কোড') প্রকাশিত হয় হলহেড-এর বই প্রকাশিত হওয়ার সাত বছর পরে,—১৭৮৫ সনে।

তার মানে নিশ্চয়ই এই নয় যে, কোম্পানির প্রেসের সেটাই প্রথম ছাপার কাজ।

পরের বছর (১৭৮৬) উইলকিনস-এর ভারতত্যাগ। দেশে ফিরে কেণ্টে তিনি নিজের বাড়িতে হরফ তৈরির কাজ চালিয়ে যান। জন জনসন-এর "টাইপোগ্রাফিয়া"য় (১৮২৪) তাঁর সেই প্রচেষ্টা সম্পর্কে অনেক খুচরো খবর আছে। তার মধ্যে কিছু শোনার মতো। জনসন লিখছেন :

"When he had compiled from the most celebrated native grammars and commentaries, a work entirely new to England, on the structure of the Sanskrita tongue, he cut steel letters, made punches, matrices, and moulds, and cast from them a fount of the Dev-nagari character, his only assistance being the mechanic of a country village." ১৭৯৫ সনে বই ছাপা শুরু হলো। সে-বছরই মে মাসে বাড়িতে অগ্নিকান্ড। আগুনে অনেক কিছুই পুড়ে যায়। ভাগ্যক্রমে পাণ্ডুলিপি এবং হরফের পাঞ্চগুলো বেঁচে যায়। দশ বছর পরে কোম্পানির কর্তৃপক্ষের উৎসাহে আবার কাজে লাগেন তিনি। জনসন লিখছেন মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসে এটাও এক স্মরণীয় ঘটনা।—"This is a circumstance not less interesting as a typographical anecdote, than it is as an instance of honourable and erudite industry; it is like Mercator engraving and colouring his own Maps, or Aldus and Stephens working at their own presses and letter cases." জনসন তাঁর বইয়ে অন্যান্য হরফের সঙ্গে দেবনাগরী এবং বাংলা বর্ণমালার কিছু নমুনা ছাপিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন এগুলো উইলকিনস-এর সৌজন্যেই মুদ্রিত।

১৬। হলহেড-এর ব্যাকরণে কোথাও পঞ্চানন কর্মকারের নাম নেই। হুগলিতে ব্যাকরণ ছাপার তথা বাংলা হরফ তৈরির সব কৃতিত্ব তিনি অর্পণ করেছেন চার্লস উইলকিনসকে। উইলকিনস-এর কলমের মুখেও কখনও কোনও উপলক্ষে পঞ্চাননের নাম শোনা যায়নি। অথচ প্রথম বাংলা হরফ তৈরির সঙ্গে তাঁর নামটি এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে আজ

আর তাঁকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তিনি আমাদের "বাঙ্গালী ক্যাক্সটন"। পঞ্চাননের এই প্রতিষ্ঠার পেছনে প্রমাণ কী তা আলোচনা করা দরকার। কারণ, হলহেড-এর ব্যাকরণ উপলক্ষে উইলকিনস-এর পার্শ্বচর হিসাবে অন্য দাবিদারও আছেন। সম্প্রতি (১৯৬৪) ক্যাথারিন ডিল তাঁর একটি গ্রন্থপঞ্জীর ভূমিকায় "ইস্ট ইণ্ডিয়া ক্রনোলজিস্ট" থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন গিলখ্রীস্ট নাকি ওঁদের জানিয়েছেন উইলকিনস যে-শিল্পীর (আর্টিস্ট) সাহায্যে বাংলা হরফ তৈরি করেছিলেন তাঁর নাম শেফার্ড। অর্থাৎ, তিনিও সাহেব। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের বিবরণেও পঞ্চানন উপলক্ষে "আর্টিস্ট" বা শিল্পী শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং, ক্যাথারিন ডিল প্রশ্ন তুলেছেন—সত্য কোন্‌টা? (দ্রষ্টব্য—*Early Indian Imprints*—Katharine Smith Diehl, 1964)

"দি ইস্ট ইণ্ডিয়া ক্রনোলজিস্ট" প্রকাশিত হয় ১৮০১ সনে। তার বেশ কয় বছর আগে (অক্টোবর, ১৭৮৩) জর্জ পেরী নামক কোম্পানির একজন কর্মচারী লণ্ডনের প্রসিদ্ধ এক মুদ্রাকর নিকলসকে এক চিঠির মারফত উইলকিনস সম্পর্কে কিছু তথ্য সরবরাহ করেছেন কলকাতায় বসে। তিনি লিখছেন :

"Mr. Wilkins is the gentleman in whose hands typography has made a rapid progress ; some years ago, when in the interior parts of the country, and in the midst of thickets, with no assistance but of a people hardly civilized, he made every tool necessary to forming the punches and matrices, and casting a complete fount of Bengal characters so currently united as not to leave their junctions visible but on very minute examination ; as you may see in Mr. Halhead's Bengal Grammar at Elmsley's. . ."

এই বিবরণে কিন্তু কোনও শেফার্ডের কথা নেই, আছে স্থানীয় কারুশিল্পীদেরই সহযোগিতার কথা। চিঠিটি ছাপা হয়েছে— *A Biographical Dictionary of Living Authors*, **1816,** নামক বইয়ের পাতায়।

উইলকিনস-এর সহকারী অথবা সহযোগী হিসাবে পঞ্চানন

কর্মকারের নামটি আমাদের গোচরে এনেছেন শ্রীরামপুরের মিশনারীরা। তাঁদের কোনও কোনও বিবরণ হুগলি-পর্বের প্রায় সমসাময়িক। সুতরাং, উড়িয়ে দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ১৮০৭ সনে ওঁরা জানাচ্ছেন : "Soon after our settling at Serampore the providence of God brought to us the very artist who had wrought with Wilkins in that work and in a great measure imbibed his ideas. . ." *Memoir Relative to the Translations* 1807, ... etc.

১৮১৮ সনের জুলাই মাসে **ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া** লিখছে : "One of the very men who had assisted Wilkins in the fabrication of his types applied to the missionaries when they had resided there only a few months; and though he died in about three years, it was not till he has instructed a sufficient number of his own countrymen in the art; who in the course of eighteen years, have prepared founts of types in fourteen Indian alphabets. . ."

এ-বিবরণেও কিন্তু পঞ্চানন কর্মকারের নাম নেই। কিন্তু জানা যাচ্ছে ওঁরা এমন একজন কারিগর হাতে পেয়েছেন যিনি উইলকিনস-এর সঙ্গে কাজ করেছেন। তিনি যে এ দেশেরই কোনও কারুশিল্পী সেটাও বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসের **ক্যালকাটা খ্রীশ্চিয়ান অবজারভার** থেকে একটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন। তাতে কেরীর সহযোগী জসুয়া মার্সম্যান-এর বক্তব্য : "About two months after Carey's arrival at Serampore, with Mrs. Carey and his four sons, a native named Panchanan, of the caste of smiths, who had been instructed by in cutting punches by Lient. Wilkins, and had wrought at the same bench with him in cutting the Bengali fount of types, applied to us for employment, offering to cut a fount at a rupee four annas each letter. Filled with gratitude to God for an occurrence so unexpected, we instantly retained him, and a

fount of Bengalee types was gradually created, for about 700 Rupees, instead of £ 540 sterling, the price they would have cost in cutting at home. . ."

নিয়োগকর্তাদের নিজেদের মুখের কথা। সুতরাং, এক কথায় নাকচ করে দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। "আর্টিস্ট"টি কে ডঃ মার্সম্যানের জবানবন্দীর পরে তা নিয়ে বোধ হয় আর কোনও কূট তর্কের অবকাশ নেই। হতে পারে উইলকিনস যখন হুগলিতে এ কাজ করছিলেন তখন শেফার্ড নামে কোনও ইংরাজ বা অ্যাংগলো-ইণ্ডিয়ানও তাঁকে সাহায্য করেন। কিন্তু ছেনিকাটা এবং ঢালাইয়ের কাজে যে তাঁকে পঞ্চাননের সাহায্য নিতে হয়েছে এবিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। পঞ্চাননের বদলে অবশ্য তিনি অন্য কোনও দক্ষ কর্মকারের সাহায্য নিতে পারতেন। তবে এক্ষেত্রে ঘটনাচক্রে সেই কারুকর্মী পঞ্চানন এই যা। পঞ্চাননের কৃতিত্ব এখানেই যে, এই নব্যবিদ্যা তিনি সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন ; এবং সাহসিকতার সঙ্গে নিজেই হাত দিতে পেরেছিলেন হরফ তৈরির কাজে।

মিশনারীদের পরবর্তী রচনায় কিন্তু তাঁর নাম যত্রতত্র। জর্জ স্মিথ লিখছেন : "He (Wilkins) taught the art to a native blacksmith, Panchanan, who went to Serampore in search of work just when Carey was in despair for a fount of the sacred Devanagari type for his Sanskrit Grammar, and for the founts of the other languages besides Bengali which had never been printed. . ."

জে. সি. মার্সম্যান লিখেছেন : "'He (Charles Wilkins) gave instruction in the art which he had accuried to an expert native blacksmith of the name of Panchanan, through his labours it became domesticated in Bengal. . ."

হলহেড-এর মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশ করে ১৮৩০ সনের ১৮ সেপ্টেম্বর **সমাচার দর্পণ** লিখেছিল— "হালহেড সাহেব।—অপর পূর্বে ভারতবর্ষে বাসকারি অন্য একজন সাহেবের মৃত্যুর সম্বাদ আমারদের প্রকাশ্য হইয়াছে বিশেষতঃ ইংগলণ্ড দেশাগত সম্বাদপত্রে লেখেন যে

হালহেড সাহেব অতি বৃদ্ধ হইয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন অনুমান হয় যে উক্ত সাহেব ইংগ্লন্ডীয়েরদের মধ্যে প্রথমেই বাঙ্গালা ভাষা সুশিক্ষিত হন এবং ঐ ভাষায় যে প্রথম গ্রামার হয় তাহা তিনিই প্রথমে প্রস্তুত করিয়া হুগলি নগরে ১৭৭৮ সালে মুদ্রিত করেন। এবং সেই পুস্তক যে বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত তাহা ভারতবর্ষে প্রথম প্রস্তুত অক্ষরেতে হয়। অনুমান হয় যে সেই অক্ষরের ছেনি উইলকিনস সাহেব আপন হস্তে প্রস্তুত করেন। এই অক্ষর অতি বৃহৎ বটে যেহেতুক তাহা এই সম্বাদপত্রে মুদ্রাঙ্কিতাপেক্ষা তিনগুণ বড় কিন্তু তদনন্তর যে হরপ প্রস্তুত হইয়া গবর্ণমেন্টের ১৭৯৩ সালের আইন মুদ্রিত হয় তদপেক্ষা তাহা উৎকৃষ্ট। সেই অক্ষর কোন্ ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত হয় তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে অক্ষম। কিন্তু উইলকিনস সাহেব পঞ্চাননামক এক ব্যক্তিকে তাহা শিক্ষা করান ইহা জ্ঞাত আছি অতএব ঐ অক্ষর তদ্দ্বারা প্রস্তুত হয় এমত অনুমান হইতে পারে।”

“বেঙ্গল অবিচ্যুয়ারি”-তে (১৮৪৮) কেরীর কাহিনী বিবৃত করতে গিয়ে বলা হয়েছে : “About two months after Carey's arrival at Serampore, with Mrs. Carey and his four sons, a native named Panchanan, who had been instructed in cutting the Bengalee fount of types applied for employment offering to cut a fount at a rupee four annas each letter. Filled with gratitude to God for an occurence so unexpected, the brethren instantly retained him, and a fount of Bengalee types was gradually created for about 700 rupees, instead of £ 540 sterling. . .”

চার্লস উইলকিনস-এর সঙ্গে পঞ্চানন কর্মকার এবং পঞ্চানন কর্মকারের সঙ্গে বাংলা-ছাপার হরফের সম্পর্ক কী তা নিয়ে অতঃপর বোধ হয় আর সওয়ালের প্রয়োজন নেই। বাংলা মুদ্রণ-শিল্পের আদি পর্বের জন্য দ্রষ্টব্য : *“The life and Times of Carey, Marshman and Ward, embracing the History of the Serampore Mission,* (2 Vols.), —Jhon Clark Marshman, London, (1869) ; *The Life of William Carey—Shoemaker and Missionary—*

George Smith; *Early Indian Imprints*—Katharine Smith Diehl, 1964; *A Biographical Dictionary of the Living Authors of Great Britain and Ireland,* London, 1816; *The East India Chronologist,*—John Hawkesworth, Calcutta, 1801; *Bengal Obituary or A Record to Perpetuate the Memory of Departed Worth*—Holmes and Co, Calcutta, 1848; *Progress of Indian Literature, Friend of India,* July, 1818; **সংবাদপত্রে সেকালের কথা** (২য় খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৫৬; **বাংলা ছাপার হরফের জন্মকথা**—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৪৪; (এই প্রবন্ধটিই 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র দ্বিতীয় খণ্ডে সম্পাদকীয় রচনা হিসাবে পুনর্মুদ্রিত।) *Early Bengali Printing on Paper*—S. C. Guha, *Memoirs of the Madras Library Asso.,* 1941; *Romance of the Bengali Types*—J. C. Bagal, *The Hindusthan Standard,* Calcutta, March 2, 1954; *Bengali Printing in the 18th century*—Barun Kumar Mukherji, *Bulletin of the Victoria Memorial,* (Vol—III-V, 1969-70), Calcutta; **বিশ্বকোষ** (পঞ্চদশ ভাগ)—নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত, ১৩১১; **বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা**—মুহম্মদ সিদ্দিক খান, ঢাকা, ১৩৭১।

১৭। "A printing press was in operation in Madras in 1772 and in 1779 an official printing press was established at Calcutta. The latter was under the direction of Sir Charles Wilkins who became known as the father of native typography in Bengal."—*The Indian Press*—Margarita Barns, 1940.

এই ছাপাখানায় কিছু ছাপাতে চাইলে খরচ কেমন পড়বে সরকারী নির্দেশনামায় (৮ জানুয়ারি, ১৭৭৯) তাও বলে দেওয়া হয়েছিল।

"For English Impressions.

For every Quire of Folio Post, paper included.

If printed on one side—Sa. Rs. 3

If printed on both sides—Sa. Rs. 5

For Persian and Bengali

For every Quire of Folio Post

Printed on one side—Rs. 5

Do Do —Rs. 7"

দেখা যাচ্ছে কলকাতায় তখন বাংলা ভাষায় ছাপার খরচ সবচেয়ে বেশি। এই সরকারী হিসাবটি সজনীকান্ত দাস তাঁর **বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস**-এ উদ্ধৃত করেছেন।

১৮। **দি ক্যালকাটা গেজেট এন্ড ওরিয়েন্টাল অ্যাডভারটাইজার**-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৭৮৪ সনের মে মাসের ৪ তারিখে। প্রতিষ্ঠাতা—ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন। অনেকের ধারণা গেজেট যেখানে ছাপা হতো সেটাই বুঝি সরকারী ছাপাখানা। কিন্তু তা নয়। "ক্যালকাটা গেজেট" অনেক প্রেসেই মুদ্রিত হয়েছে। তার যাত্রা শুরু ৩৭নং লারকিনস লেনে, তারপর ৬নং চৌরঙ্গী রোডে এবং ৮নং কসাইটোলা স্ট্রীটে,—কোম্পানির ছাপাখানায়। এভাবে চলে ১৮১৫ সনের মে মাস অবধি। জুন মাসে তার নাম হয়ে যায় "গভর্নমেন্ট গেজেট",—ছাপার দায়িত্বও গ্রহণ করেন অন্যরা, মিলিটারি অরফ্যান সোসাইটির ছাপাখানা। ১৮৩২ সনে আবার "ক্যালকাটা গেজেট" নাম ফিরে এলো কাগজের মাথায়। মুদ্রাকর অবশ্য অপরিবর্তিত,—মিলিটারি অরফ্যান প্রেস। ওঁদের ঠিকানা ছিল প্রথমে ১নং ম্যাঙ্গো লেন, তারপর ২নং হেয়ার স্ট্রীট। ১৮৫৩ সনে স্যামুয়েল, স্মিথ এন্ড কোং নামে একটি প্রতিষ্ঠান গেজেট ছাপবার দায়িত্ব পেলেন। ওঁদের ছাপাখানা ছিল ৫নং কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটে। ১৮৫৯ সন থেকে ক্যালকাটা গেজেট ছাপাচ্ছেন বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট। এক সময় ওঁদের ছাপাখানা ছিল ২৮নং চৌরঙ্গীতে। সেখান থেকে রাইটার্স বিল্ডিংস হয়ে ১৯২৩ সনে ঠিকানা বদলে পাকাপাকিভাবে ৩৮নং গোপালনগর রোডে। "ক্যালকাটা গেজেট" এখনও ছাপা হয় সেখানেই। সীটন কার সম্পাদিত "ক্যালকাটা গেজেট"-এর নির্বাচিত অংশের সংকলনের প্রথম খন্ডে গ্ল্যাডউইনের ছাপাখানার ঠিকানা বদলের খবর মেলে। ১৭৮৭ সনের ২৯ মার্চ বলা হয়—আজ থেকে ছাপাখানা চলে যাচ্ছে লালবাজারে হারমনিক-এর উল্টো দিকে।

গেজেটের ছাপাখানা এবং কপিরাইট নিলামে বিক্রির বিজ্ঞাপন ছাপা হয় সংকলনের পঞ্চম খণ্ডে। সেটা ১৮১৮ সনের ফেব্রুয়ারির কথা। "ক্যালকাটা গেজেট"-এর এই রোমাঞ্চকর কাহিনীর জন্য দ্রষ্টব্য : *The story of Calcutta Gazette,*—A. C. Dasgupta, 1957, সমসাময়িক অন্যান্য খবরের কাগজের বৃত্তান্ত পাওয়া যাবে—*The Indian Press,/A History of the growth of public opinion in India* —Margarita Barns, 1940 ; *History of Indian Journalism*— J. Natarajan, 1955 ; ইত্যাদি বইয়ে। সংবাদপত্র শাসনের কাহিনীও এই দুটি বইয়ে সবিস্তারে বর্ণিত। আগে উল্লেখিত ছাপাখানা সংক্রান্ত প্রিয়লকার-এর বইটিতে সরকার বনাম ছাপাখানার দ্বন্দ্বযুদ্ধের বিবরণ রয়েছে।

১৯। এন. বি. এডমনস্টোন-এর দুটি বই-ই ছাপা হয়েছিল—"দি অনারেবল কোম্পানিজ প্রেস"-এ।

২০। "দি সিজনস"-এর বিজ্ঞাপন ছাপা হয় "ক্যালকাটা গেজেট"-এ ১৯৭২ সনের ৫ এপ্রিল। বলা হয়—গেজেট অফিসে প্রকাশিত হল। সংস্কৃত ভাষার কোনও বই এই নাকি প্রথম ছাপা হল। হরফ কিন্তু বাংলা। তার চার বছর আগে, ১৭৮৮ সনে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত "এশিয়াটিক রিসার্চ"-এর পৃষ্ঠায়ও কিন্তু উইলিয়াম জোন্স-এর একটি রচনায় সংস্কৃত ভাষা বাংলা হরফে ছাপা হয়েছে। মুদ্রাকর—কোম্পানির ছাপাখানার ওঁরা। "দি সিজনস" বা "ঋতুসংহার"-এর দাম ছিল দশ টাকা, "এশিয়াটিক রিসার্চেস" (১ম খণ্ড) বিক্রি হতো প্রতি পৃষ্ঠা দু' আনা দরে।

২১। "The Great Cornwallis Code of 1793, translated into simple and idiomatic Bengalee by Mr. Forster, the most eminent Bengalee Scholar till the appearance of Mr. Carey was likewise printed at the Government Press, but from an improved fount. It was to this fount that Mr. Carey, alludes, and it continued to be the standard of typography till it was superseded by the smaller and neater fount at Serampore. . ." *The Life and Times of Carey, Marshman*

and Ward. etc., J. C. Marshman, Vol—I, 1859. এই হরফ যে পঞ্চাননই তৈরি করেছিলেন, বলা নিষ্প্রয়োজন, তার কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। সজনীকান্ত দাস এ-ব্যাপারে "নববার্ষিকী" থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন, এই যা।

২২। ১৯৭২ সনের ২৫ অক্টোবর "ক্যালকাটা গেজেট"-এ "ক্রনিক্যাল প্রেস"-এর ছয় ভাগের এক ভাগ শেয়ার বিক্রির কথা ঘোষণা করেন এ. আপজন। ওই নামে কাজটির যাত্রা শুরু ১৭৮৬ সনে। বিজ্ঞাপনে বলা হয়—ছাপার যন্ত্র ছাড়াও বিক্রি হবে টাইপ, ফ্রাউণ্ড্রি এবং পার্সি, নাগরী এবং বাংলা হরফ তৈরির ছাঁচ। এরকম পরিচ্ছন্ন এবং সর্বাঙ্গসুন্দর হরফ নাকি আর নেই। কিন্তু আপজনের ছাপা বাংলা বইটির হরফ কিন্তু মোটেই ভাল নয়। বরং বলা যায় সমসাময়িক অন্যান্য বাংলা ছাপার চেয়ে বেশ খারাপ। এই আপজনই কিন্তু ১৭৯২-৯৩ সনে তৈরি করেন শহর কলকাতার বিখ্যাত মানচিত্র। মানচিত্রটি প্রকাশিত হয় ১৭৯৪ সনে। "ক্রনিক্যাল প্রেস"-এর ঠিকানা ছিল—৮নং লালবাজার।

২৩। গ্ল্যাডউইন কিংবা কোম্পানির ছাপাখানা ছাড়াও অষ্টাদশ শতকের কলকাতায় আরও কয়েকটি ছাপাখানা ছিল। ১৭৮০ সনে **হিকির গেজেট**-এর আবির্ভাবের পর পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে নানা ধরনের অন্তত পাঁচখানা খবরের কাগজ ভূমিষ্ঠ হয় কলকাতায়। কাগজের দুনিয়ায় সেকালেও শিশুমৃত্যুর হার সুউচ্চ। তবু ১৭৯৯ সনে ওয়েলেসলি যখন খবরের কাগজকে নিয়ন্ত্রণে আনতে উদ্যোগী হন কলকাতায় কমপক্ষে সাত সাতটি কাগজ। সবই অবশ্য ইংরাজী কাগজ। সাহেবপাড়ার এসব কাগজের সকলের ভাণ্ডারে হয়তো ফার্সি কিংবা বাংলা হরফ ছিল না, কিন্তু কারও কারও যে ছিল ছাপা বাংলা বিজ্ঞাপন বা বাংলা বইগুলোই তার প্রমাণ। তাছাড়া ফেরিস এণ্ড কোম্পানির মতো আরও এক-আধটি মুদ্রাকর প্রতিষ্ঠান থাকা সম্ভব যাঁরা শুধু বই-ই ছাপতেন। সে সময়কার খবরের কাগজের নামধাম এবং জীবন বিবরণের জন্য মার্গারিটা বার্নস-এর লেখা ভারতীয় সংবাদপত্র বিষয়ক বইখানাই যথেষ্ট। খুচরো কিছু খবর পাওয়া যাবে—**বেঙ্গল পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট**-এর (৮৭ খণ্ড, ক্রমিক সংখ্যা—১৬৩, জানুয়ারি-জুন, ১৯৬৮) পাতায়। তাতে এস. বি.

চৌধুরী এবং কালীকিঙ্কর দত্তের লেখা দুটি প্রবন্ধ রয়েছে আদি মুদ্রাকরদের বিষয়ে।

২৪। দ্রষ্টব্য : *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward,* Vol—I, 1859.

২৫। বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৮৯ সনের ২৩ এপ্রিল। বক্তব্য : "The humble request of several Natives of Bengal. We humbly beseech any gentlemen will be so good to us as to take the trouble of making a Bengal Grammar and Dictionary, in which we hope to find all the common Bengal Country words made into English. By this means we shall be enabled to recommend ourselves to the English Government and understand their orders; this favour will be gratefully remembered by us and our posterity for ever."—*Selections from the Calcutta Gazettes,* (Vol—II). সন্দেহ নেই বাঙালী ভদ্রমহোদয়রা বুদ্ধিমান ছিলেন ; তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন হাওয়ার গতি কোন দিকে। ইউরোপীয়রা যখন দেশটিকে হাতে রাখার জন্য দেশের ভাষা রপ্ত করতে উঠেপড়ে লেগেছেন, দেশের কিছু মানুষ তখন নতুন প্রভুদের কাছাকাছি পেঁছোবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পথ খুঁজছেন। মনে রাখতে হবে, এদেশের সরকারী ভাষা তখনও ফার্সি ; অথচ দেশের মানুষের দৃষ্টিতে ক্রমেই দরকারী হয়ে উঠছে ইংরাজী ভাষা। তৎকালে ভাষা-চর্চার ব্যাপকতা বোঝা যায় মুদ্রিত অভিধানের তালিকাটির দিকে এক নজর তাকালে। এ-ধরনের একটি তালিকা রচনা করেছেন শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মশাই। দ্রষ্টব্য : *A Review of The Lexicography in Bengali*—J. M. Bhattacharjee, *Muhammad Shahidullah Felicitation Volume,* Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1966.

২৬। ওয়ার্ডের এই বিবরণটি পিয়ার্স কেরীর লেখা কেরী-জীবনী ছাড়াও কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার আয়োজিত কেরী-প্রদর্শনী উপলক্ষে মুদ্রিত স্মারক গ্রন্থটিতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। শ্রীরামপুরের মিশন এবং মিশনারীদের বিষয়ে অজস্র বই রয়েছে। আমরা এই রচনায় যে কয়খানা

বিশেষভাবে ব্যবহার করেছি এখানে শুধু তারই উল্লেখ করা হচ্ছে। শ্রীরামপুর মিশনের কাগজপত্র সবই এখন লণ্ডনে ব্যাপটিস্ট মিশনের মহাফেজখানায়। সেখানে কী আছে তার আভাস পাওয়া যাবে শ্রীরামপুরের কেরী লাইব্রেরিতে রাখা একটি দলিল-পঞ্জীতে। তাতে শ্রীরামপুরের ছাপাখানা এবং কাগজকল প্রসঙ্গেও চিঠিপত্রাদির উল্লেখ রয়েছে। এদেশীয় গবেষকদের কেউ কেউ লণ্ডনের কাগজপত্রও দেখেছেন বটে, তবে মুদ্রণ-শিল্পের ইতিহাস রচনার জন্য নয়। সেসব দলিলপত্র এখনও ভবিষ্যতের কোনও গবেষকের অপেক্ষায়। সাধারণভাবে শ্রীরামপুরের ছাপাখানার জন্য দ্রষ্টব্য :

The Life and Times of Carey, Marshman and Ward..., (2 Vols),—J. C. Marshman, 1859 ; *William Carey*, D. D., *Fellow of the Linnaean Society*,—Samuel Pearce Carey, 1923 ; *The Life of William Carey, Shoemaker and Missionary* —George Smith, (Everyman) ; *Memoir of William Carey* —Eustace Carey, 1836 ; ইত্যাদি। বাংলায় উইলিয়াম কেরীর উল্লেখযোগ্য জীবনী : মহেন্দ্রলাল চৌধুরীর **আদর্শ চরিত**, ১৮৮০ ; অমৃতলাল সরকারের **ভারতবন্ধু উইলিয়াম কেরী**, ১৯৩৪ ; এবং সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের—**বাংলার নব জাগরণে উইলিয়াম কেরী ও তাঁর পরিজন**, ১৯৭৪। এ ছাড়া অবশ্যপাঠ্য—সজনীকান্ত দাসের **বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস**, নতুন সংস্করণ, ১৩৬৯।

২৭। শ্রীরামপুরে কয়টি ছাপাখানা ছিল?

১৮১২ সনের ১১ মার্চ সন্ধ্যায় শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। মিশনারীদের ওপর দিয়ে নানা সময়ে নানা ধরনের ঝড় বয়ে গেছে। কখনও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে, কখনও দেশান্তরীর হুকুমনামা। একসময় নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ছাপাখানা-টিকে শ্রীরামপুর থেকে কলকাতায় উঠিয়ে আনতে। সংকটের পর সংকট। কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে বুঝি-বা কোনও বিপদেরই তুলনা হয় না। হাজার হাজার রীম কাগজ, মন মন হরফ, মূল্যবান পাণ্ডুলিপি—সব ভস্মীভূত। ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে কেরী বলেছিলেন—এক সন্ধ্যায়

বছরের পর বছরের শ্রম নষ্ট হয়ে গেল। এই অগ্নিকাণ্ডের বিবরণ মিশন বা কেরী-সংক্রান্ত প্রায় বইয়েই রয়েছে। সিদ্দিক খান তাঁর **বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা**-য় একটা টুকরো খবর দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—"এই সব টাইপের কিছু কিছু পোড়া জমাট ধাতুর আকারে খুঁজে পাওয়া যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। যুদ্ধের সময় শ্রীরামপুর কলেজটিকে সামরিক কর্তৃপক্ষ দখল করেন। যুদ্ধের শেষে পূর্বতন কর্তৃপক্ষের হাতে কলেজটি ফিরিয়ে দিলে কলেজের খেলার মাঠে দালানের ভিত্তি খননকালে এসব আবিষ্কৃত হয়।"

অগ্নিকাণ্ডের পরদিন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে ওয়ার্ড কিন্তু আবিষ্কৃত করেছিলেন অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য।—অনেক কিছুই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, কিন্তু হরফ তৈরির পাঞ্চ, ম্যাট্রিক্স এবং পাঁচটি ছাপার কল অক্ষত। জর্জ স্মিথ যেসব বিবরণ উপস্থিত করেছেন তাতে মনে হয় শ্রীরামপুরে তখন পাঁচখানাই ছাপার যন্ত্র ছিল। কিন্তু কয়দিন পরে, মার্চ মাসের উনিশ তারিখে "ক্যালকাটা গেজেট"-এ এই অগ্নিকাণ্ডের যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয়েছে—আটখানা ছাপার কল বেঁচে গেল।—"It is with pleasure we add, that the Printing Presses to the number of eight having been placed in a seperate apartment, have escaped the flames. The Matrices also of all the types have been preserved". (*Selections,* Vol-III)

২৮। কলকাতায় ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীরামপুরের একটি দল-ছুট গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীতে ছিলেন উইলিয়াম ইয়েটস, উইলিয়াম হপকিন্স পীয়ার্স, ইউস্টেস কেরী, জন লসন প্রমুখ নবীন মিশনারীরা। শ্রীরামপুরে প্রবীণদের সঙ্গে নানা বিষয়ে বিরোধের ফলেই এঁরা চলে আসেন কলকাতায়। শ্রীরামপুরের নকশা মাফিক এখানেও তাঁরা প্রতিষ্ঠা করলেন মিশন, মণ্ডলী এবং ছাপাখানা। এসব ১৮১৮ সনের কথা। সে-বছরই সেপ্টেম্বর মাসের ৩ তারিখে এই ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হল কলকাতা ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রথম বই,—একটি খ্রীষ্টীয় নীতিগ্রন্থ। তারপর ধীরে ধীরে কেমন করে এই ছাপাখানাটি শহরের অন্যতম মুদ্রণ কেন্দ্রে পরিণত হয় সে-কাহিনীও শ্রীরামপুরের মতোই চমকপ্রদ।

জন মারডক তাঁর সংকলিত গ্রন্থপঞ্জীর ভূমিকায় কলকাতার

ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস সম্পর্কে একটি বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন। বিবরণটি শোনার মতো। সংক্ষেপে তার মর্ম : শহরতলির একটি কুটির। বাঁশের খুঁটি, খড়ের ছাউনি। তারই তলায় সামনে খোপে খোপে টাইপ সাজিয়ে নিবিষ্ট মনে কাজ করছেন রেভাঃ পীয়ার্স। তার একপাশে একটা পুরানো কাঠের ছাপার কল। যন্ত্রটি স্থূল। তাই দিয়ে ১৮১৮ সনের ৩ সেপ্টেম্বর ছাপানো হলো দুটি ছোট্ট বাংলা বই। দুই মিলিয়ে সংখ্যা একুনে ছ' হাজার। সে-মাসেরই শেষ দিকে আরও একখানা বই ছাপাবার উদ্যোগ। এলো আরও একখানা নতুন প্রেস। এমনি করেই অতি দ্রুত তালে এগিয়ে চলল ওঁদের ছাপাখানা। কুড়ি বছর পরে দেখা গেল দুই ফাউণ্ট টাইপের বদলে ভাণ্ডারে বাষট্টি ফাউণ্ট টাইপ। ভারতের এগারোটি প্রধান ভাষায় বই ছাপা হয় সেখানে। একটি নড়বড়ে কাঠের ছাপাখানার বদলে কাজ করে চলেছে সাত সাতটি লোহার ছাপার কল।

ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস সেখানেই থমকে দাঁড়িয়ে যায়নি। তারপরও অগ্রগতি তার অব্যাহত। মিশনের এক ইতিহাস-লেখক জানিয়েছেন—সেখানে "১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ৭০,০০০ ট্রাক্ট, স্কুলপাঠ্য এবং ডঃ ইয়েটস-প্রণীত সংস্কৃত ব্যাকরণ মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ ইয়েটস বাংলা নূতন নিয়মের একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিলেন। ইহা ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই প্রেসে বেশ লাভ হইত। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে মিশন-কার্য্যের জন্য ইহা ব্যাপটিস্ট মিশনকে প্রায় ১৫,০০০ টাকা দিয়াছিল।" ১৮৫৭ থেকে ১৮৬৭ সন—এই দশ বছরে মিশনের কাজের জন্য ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস দিয়েছে নাকি ৪,৮০,০০০ টাকা। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে কলকাতায় লোয়ার সার্কুলার রোডের ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস এক বিশিষ্ট প্রকাশন কেন্দ্র। শ্রীরামপুরের মতোই নানা ভাষার হরফও তৈরী হতো সেখানে। ওঁদের তৈরী হরফে কাজ চলতো অন্যান্য ছাপাখানায়ও। এক সময় এখানেও ছাপা হতো কমপক্ষে চল্লিশটি ভাষায়। সেদিক থেকে কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের সার্থক উত্তরাধিকারী।

ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস গত শতকে বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুদ্রাকর। বাংলা হরফের উন্নতির জন্যও তাঁদের উৎসাহের অন্ত ছিল

না। কলকাতায় স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৭ সনের জুলাই মাসে। মিশন প্রেসের সঙ্গে সূচনা থেকেই সোসাইটির নিবিড় সম্পর্ক। বাংলা হরফ এবং ছাপার কাজ উন্নত করাও ছিল সোসাইটির আর এক লক্ষ্য। এ-ব্যাপারে তাঁদের প্রধান সহায় ছিলেন মিশন প্রেস। বাংলায় 'ইটালিকস' নেই, ছাত্ররা যাতে সহজে বিশেষ্য, উদ্ধৃতি কিংবা বিশেষ কোনও শব্দ বা বাক্য ধরতে পারে তার জন্য ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের উইলিয়াম হপকিন্স পীয়ার্স তৈরী করেছিলেন 'ইটালিকস'-এর বিকল্প এক বিশেষ ছাঁদের বাংলা হরফ। এই হরফের বৈশিষ্ট্য তার মাত্রায়। যে শব্দ বা বাক্যটিকে বিশেষভাবে নির্দেশ করা হচ্ছে তার মাত্রা সোজা, আর বাকি সব হাতের লেখার আদলে বাঁকা। সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণে (১৮১৯-২০) এই হরফ তৈরীর ইতিহাস এবং নমুনা দুই-ই রয়েছে। আজকের খুঁতধরা দর্শকও বোধহয় এক কথায় নাকচ করে দিতে পারবেন না পীয়ার্স সাহেবের সেই অভিনব বাংলা হরফ।

মিশনের দুটি প্রেস এক দেহে লীন হয়ে যায় ১৮৩৭ সনে। শ্রীরামপুর কলেজ থেকে মাইলখানেক দূরে সেখানকার প্রেসের খ্রীষ্টান কর্মীদের একটি উপনিবেশ গড়ে তোলা হয়েছিল। জন ক্লার্ক মার্সম্যানের নামে বসত-পল্লীটির নাম রাখা হয়েছিল জন-নগর। '৩৭ সনে শ্রীরামপুরের ছাপাখানা উঠিয়ে দেওয়ার পর জন-নগর ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও কিন্তু নানা পুঁথিপত্রে পরবর্তীকালেও দেখা যায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের নাম। ক্যাথরিন ডিল কেরী-গ্রন্থাগারের ৩৩০টি বইয়ের যে ছোট্ট তালিকা প্রকাশ করেছিলেন তাতে শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস থেকে ১৮৩৪, ১৮৪২, এমনকি ১৮৫৮ সনে ছাপা বইও উল্লেখিত। তবে আমাদের মনে হয় সেগুলি আসলে **ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া** ছাপবার জন্য মিশন প্রেসের যে ভগ্নাংশ শ্রীরামপুরে থেকে যায় সেখান থেকে ছাপা। অগ্নিকাণ্ডের পর নদীর ধারে পরিত্যক্ত যে-গুদামটিতে মিশন প্রেস নতুন করে সাজানো হয় সেখানেই ছিল "ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া" কার্যালয়। স্মিথ তাঁর কেরী-জীবনীতে লিখেছেন—"He (Ward) had already opened out a long warehouse nearer the river shore, the lease of which had fallen into them, and he had already planned the occupation of that uninviting place in which the

famous press of Serampore and at the last, the Friend of India weekly newspaper found a home till 1875." শ্রীরামপুরের পুরানো মানচিত্রে কিন্তু কলেজ, ছাপাখানা, কাগজকল সবই চিহ্নিত। জায়গাগুলো এখনও দিব্যি সনাক্ত করা যায়। মিশনের টাইপ-ফাউণ্ড্রিটি চালু ছিল ১৮৬০ সন পর্যন্ত।

কলকাতার ঐতিহ্যময় ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস বন্ধ হয়ে যায় ১৯৭০ সনের মার্চ মাসে। লোয়ার সার্কুলার রোডের ওপর এই সেদিন পর্যন্তও যেখানে সগর্বে বিজ্ঞাপিত হত এই সংবাদ—"প্রিণ্টারস ইন ফোরটি ল্যাঙ্গুয়েজেস", এখন সেখানে পাঁচিল ঘেরা মাঠ। ছাপাখানা, হরফ তৈরির কারখানা সব উধাও।

কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের কাহিনীর জন্য দ্রষ্টব্য :

A Catalogue of the Christian Vernacular Literature of India with Hints on the management of Indian Tract Societies—John Murdock, 1870; *Ye are my witness*, ১৭৯২—১৯৪২, *One hundred and Fiftieth Anniversary of the Baptist Missionary Society in India, 1942*; *British Baptist Missionaries in India, 1793—1837*,—E. Daniel Potts, 1967; *Missionaries and Education in Bengal*, 1793—1837,—M. A. Laird, 1972; **বঙ্গে যীশুর জয়যাত্রা**—ক্ষিতীশচন্দ্র দাস, ১৯৪২।

২৯। প্রসঙ্গত শ্রীরামপুরের মিশন পরিচালিত কাগজকলটির কথাও উল্লেখযোগ্য। স্মিথ-লিখিত কেরী-জীবনীটিতে তার মোটামুটি একটা বিস্তৃত বিবরণ আছে। **বিবিধার্থ সংগ্রহ** পত্রিকার ১৫ খণ্ডে (২য় পর্ব, শকাব্দ ১৭৭৪, ফাল্গুন) এদেশের কাগজ শিল্প সম্পর্কে একটি রচনা আছে। তাতে লেখা হয়েছে—"পরন্তু বঙ্গদেশীয় কাগজ ভারতবর্ষের অধিকাংশে ব্যবহৃত হয়। বর্ধমান প্রদেশের নিয়ালা, সাতগাঁ, মানাদ, শাহবাজার এবং মৈনন গ্রামসকল ও বালেশ্বর, বাঙ্কিপুর আরওয়াল, শাহার, হরিহরগঞ্জ, ঢাকা, দিনাজপুর, পাবনা, মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা ও শ্রীরামপুর নগরসকল কাগজ প্রস্তুতকরণের প্রধান স্থান। এই সকল স্থানে যে কাগজ প্রস্তুত হয় তাহা সমগুণবিশিষ্ট নহে। শ্রীরামপুর,

বর্ধমান ও ঢাকাই কাগজ দেশীয় অন্য কাগজাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ ; এবং পাটনাই কাগজ অপকৃষ্ট।” সুতরাং শুধু শ্রীরামপুরেই যে কাগজ তৈরি হতো এমন নয়। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের কৃতিত্ব ও'রাই বোধহয় প্রথম কলে কাগজ তৈরির ব্যবস্থা চালু করেন। প্রথমে ও'দের কাগজকল চালানো হতো পায়ে,—পুরোপুরি শ্রমিকের গায়ের বলে। একবার দুর্ঘটনায় একজন শ্রমিক মারা যান। তারপর ও'রা বিলাত থেকে আমদানি করেন বারো-অশ্বশক্তিসম্পন্ন একটি বাষ্পীয় ইঞ্জিন। ১৮২০ সনের ২৭ মার্চ তার শুভ উদ্বোধন। সেদিন নাকি "আগুন-কল" দেখবার জন্য কৌতূহলী দেশী বিদেশী দর্শকদের সে কী ভিড়! নানা কারণে, বিশেষ করে কোম্পানির কর্তৃপক্ষের নীতির পরোক্ষ চাপে মিশনারীদের এই কাগজকলটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় ১৮৬৫ সনে। এখন সেখানে ধোঁয়া উদ্গিরণ করছে একটি চটকলের চিমনি। উল্লেখ্যঃ এই আগুন-কলেই নাকি তৈরি হয়েছিল আঠারোশ' সাতান্নর মহাবিদ্রোহের তথাকথিত উপলক্ষ—ঐতিহাসিক সেই চর্বিওয়ালা কার্তুজ। কাগজকল অবশ্য তখন আর মিশনারীদের হাতে নেই।

দ্রষ্টব্য : *The Life of William Carey, Shoemaker and Missionary*—George Smith ; *Early Indian Imprints,—An Exhibition from the Carey Historical Library of Serampore*—Katharine Smith Diehl, 1962.

৩০। শ্রীরামপুর প্রেস থেকে মুদ্রিত বইপত্র সম্পর্কে খবরাখবরের জন্য সুশীলকুমার দে এবং সজনীকান্ত দাসের বই ছাড়াও দেখা দরকার—*A Descriptive Catalogue of* 1400 *Bengali Books and Pamphlets*—Rev. J. Long, 1855. এই তালিকাটি দীনেশচন্দ্র সেনের **বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে**-র অষ্টম সংস্করণে (১৩৫৬) পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে। *A Return of the Names of* 515 *persons connected with Bengali Literature*—Rev. J. Long, 1855 ; *The Early Publication of the Serampore Missionaries : A Contribution to Indian Bibliography*—G. A. Grierson, *Indian Antiquary,* vol-32, 1903 ; *William Carey and Serampore Books*—M. Siddiq Khan, *Libri,* 11, No-3, 1961 ; *Early Indian*

Imprints—Katharine Smith Diehl, 1964; **বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা**—মুহম্মদ সিদ্দিক খান, ঢাকা, ১৩৭১।

৩১। পঞ্চানন কর্মকার সম্পর্কে কিছু খবর আগেই দেওয়া হয়েছে। এবার কেরীর সঙ্গে পঞ্চাননের যোগাযোগের কথা শোনা যাক। বিলাত থেকে হরফ তৈরি করিয়ে আনাতে না পেরে কেরী যখন বিষণ্ণ তখনই খবর পাওয়া গেল কলকাতায় দিশি হরফ ঢালাইয়ের একটি কারখানা গড়ে উঠেছে। ১৭৯৮ সনের জানুয়ারিতে তিনি লিখছেন—আমার মনে হয় বাইবেল ছাপার জন্য এদেশে হরফ সংগ্রহ করতে পারলে সেটাই হবে সস্তা এবং ভাল। এই কারখানাটি সম্পর্কে জে. সি. মার্সম্যান লিখছেন—"All trace of the author or the result of this project has been lost except the fact that the punches were cut by the workman whom Sir Charles Wilkins had trained up. Mr. Carey immediately placed himself in communication with the projector of this scheme, and relinquished all idea of obtaining Bengalee types from England."

১৭৯৯ সনের এপ্রিল মাসে কেরী নিজে লিখছেন—

"We have a press and I have succeeded in procuring a sum of money sufficient to get types cast. I have found out a man who can cast them, the person who casts for the Company's Press; and I have engaged a printer at Calcutta to superintend the casting."

পঞ্চানন কর্মকারের সঙ্গে উইলিয়াম কেরীর প্রথম যোগাযোগ কবে এবং কীভাবে—তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে এই দুটি উদ্ধৃতি থেকে। ক'মাসের মধ্যেই দেখা গেল সরকারী ঢালাইখানার কর্মী পঞ্চানন কর্মকার শ্রীরামপুরে বহাল হয়েছেন।

শ্রীরামপুরে পঞ্চানন প্রথমে হাত দেন দেবনাগরী সাট তৈরির কাজে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন "১৮০৩ সনের গোড়ায় এই কাজ প্রায় অর্ধেকটা অগ্রসর হয়।" তাছাড়া "এই কাজে নিযুক্ত থাকা কালে পঞ্চানন বাংলা অক্ষরের আরও একটি সাট তৈয়ার করে।" জে. সি. মার্সম্যান লিখছেন—"While engaged in cutting the Nagree

punches, Panchanon also completed a fount of Bengalee, smaller in size, and more elegant from that which had been used in the first edition of the Bengalee New Testament. That edition had now been distributed, and a second was called for."

শ্রীরামপুর মিশনারীদের কাগজ **সত্যপ্রদীপ** (১৮৫০) লিখেছিল—"উক্ত পঞ্চানন মিস্ত্রী তাঁহারদের (অর্থাৎ শ্রীরামপুরের মিশনারীদের) নিকট কর্ম্ম পাইয়া বাঙ্গালা ও দেবনাগর ও উড়িয়া প্রভৃতি কতিপয় ভাষায় ধর্ম্মপুস্তক প্রকাশার্থ তত্তদ্ভাষায় অক্ষর ক্ষোদন করিলেন।"

মোটকথা হলহেড-এর ব্যাকরণ, কোম্পানির প্রেসের বাংলা হরফ এবং শ্রীরামপুরে ছাপা প্রথম দিককার বাংলা বই—পঞ্চানন কর্মকারের স্মৃতি-চিহ্ন বাংলা মুদ্রণশিল্পের আদি পর্বে সর্বত্র। পঞ্চাননের গৌরবকাহিনীর সেখানেই শেষ নয়। চার্লস উইলকিনস-এর কৃতিত্ব যদি পঞ্চাননকে এ-বিদ্যায় দীক্ষিত এবং শিক্ষিত করে তোলায়, পঞ্চাননের কৃতিত্ব তবে শ্রীরামপুরে মনোহর সমেত আরও অনেক স্বদেশী কর্মীকে নিপুণ কারিগরে পরিণত করার মধ্যে। পঞ্চানন, বলতে গেলে এদেশের হরফ-শিল্পীদের গুরুস্থানীয়,—আদি আচার্য।

দ্রষ্টব্য : **বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস**—সজনীকান্ত দাস, ১৩৬১ ; **সংবাদপত্রে সেকালের কথা**—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (২য় খন্ড) ; *The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward*—J. C. Marshman ; *The Life of William Carey*—George Smith, (Everyman).

৩২। এই কাহিনীটি অনেকে অবিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেন। কারণ, শ্রীরামপুরের মিশনারীদের কোনও বিবরণে এর উল্লেখ নেই। তাছাড়া অবিশ্বাসীরা বলেন—কোলব্রুক বনাম কেরীর এই "মামলা"র কাগজপত্রই বা কোথায়? থাকলে নিশ্চয়ই গবেষকদের তা নজরে পড়ত। যেন পঞ্চানন মনোহর সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্র সব আমরা খুঁজে পেয়ে গেছি, পাইনি শুধু এই প্রমাণপত্রটাই! সম্ভাব্যতার বিচারে এ-জাতীয় ঘটনা কিন্তু পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দক্ষ কারিগরকে নিয়ে কাড়া-কাড়ি ইউরোপেও দেখা গেছে। গূঢ় বিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য গোয়েন্দা

নিয়োগ থেকে শুরু করে চৌর্যবৃত্তি ইতিহাসে কিছুই অভাবিত নয়। তা সে কামান তৈরির কারিগরি বিদ্যা হোক, মানচিত্র আঁকার কাজ হোক, আর হরফ নির্মাণই হোক। বিশ্ববন্দিত ফরাসী হরফ-শিল্পী নিকোলাস জেনসন যে পঞ্চদশ শতকের জার্মানীতে অভিযাত্রী সেজেছিলেন সে কিন্তু রাজকীয় মন্ত্রণায়, স্বদেশের জন্য ছাপার বিদ্যা চুরি করে আনতে। সুতরাং, চালাকি করে পঞ্চাননকে কলকাতা থেকে শ্রীরামপুরে সরিয়ে নেওয়াটা এমন আর বিচিত্র কী! পঞ্চানন যে তখন কলকাতায় একজন বিশিষ্ট কারিগর সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। হলহেড-এর ব্যাকরণের পর একযুগ ধরে ব্যবহৃত বাংলা হরফগুলোই তার প্রমাণ।

পঞ্চানন কর্মকার সম্পর্কে এই কাহিনীটি শুনিয়েছিলেন শম্ভুচন্দ্র মুখার্জি (১৮৩৯—১৮৯৪)। তাঁর নোটবই থেকে এস. সি. সান্যাল বেশ কিছুকাল পরে (১৯১৬) এটি পরিবেশন করেন **বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট**-এর পাতায়। শম্ভুচন্দ্র কিন্তু প্রথমেই বলে দিয়েছেন কাহিনীটি শুনেছেন তিনি মনোহরের ছেলের কাছে, অর্থাৎ পঞ্চাননের কন্যার পুত্রের কাছে। তিনি তখনও শ্রীরামপুরে জীবিত। তাঁর স্মৃতিচারণ থেকে আরও কিছু কিছু খবর সংগ্রহ করেছেন তিনি উত্তরকালের জন্য। মিশনারীদের সঙ্গে ওঁদের বাড়ির সম্পর্ক, রুজি রোজগারের পরিমাণ ইত্যাদি নানা তথ্য। মনোহর-পুত্র ওঁকে বলছেন—হরফের একটা পাঞ্চ কাটতে পারলে এখন পাওয়া যায় তিন টাকা। ওঁর বাবা, অর্থাৎ মনোহর পেতেন পাঞ্চ প্রতি দু'টাকা। তাঁর ধারণা, প্রথম দিকে পঞ্চানন হয়তো আরও বেশিই পেয়েছেন। ইনি বয়সকালে দিনে ৮ থেকে ১০ খানা পাঞ্চ কাটতে পারতেন, গড়ে দিনে ২০ টাকা রোজগার ছিল তাঁর। মাসে হরেদরে পাঁচ ছয় শ' টাকা ঘরে আসত। এখনও এই বুড়োবয়সেও দিনে দু' তিন টাকার কাজ করেন তিনি।

কোলব্রুক-কেরী বিবাদ সম্পর্কে শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন :

"There was I believe, references to Home, but in vain. Carey said that Colebrooke should not be allowed to keep a monopoly of a man who was the only artisan of the kind in all India".

দ্রষ্টব্য : *Secretary's Note Book*— S. C. Sanial, *Bengal Past and Present,* Vol—13, Part—I, July—Sept, 1916.

৩৩। মনোহরও নাকি পঞ্চাননের মতো ত্রিবেণীরই লোক। অন্তত সমসাময়িক বিবরণ তা-ই বলে। মিশনের হরফ-তৈরির কারখানায় পঞ্চাননই তাঁকে নিয়ে আসেন। পঞ্চাননের কোনও পুত্রসন্তান ছিল না। একটি মাত্র কন্যা ছিল। নাম তাঁর—লক্ষ্মীমণি। মেয়েটিকে তিনি আপন শিষ্য মনোহরের হাতেই অর্পণ করেন। এসব ঘটনা পঞ্চাননের মিশন প্রেসে যোগ দেওয়ার দু' চার বছরের মধ্যে। অর্থাৎ পঞ্চাননের মৃত্যুর (১৮০৩-৪) আগে। মনোহরের নিয়োগ এবং কৃতিত্ব সম্পর্কে জন ক্লার্ক মার্সম্যান লিখেছেন—

"To accelerate the progress of the work, Panchanon was advised to take an assistant, and a youth of the same caste and craft, of the name of Monohar, an expert and elegant workman, who was subsequently employed for forty years at the Serampore press, and to whose exertions and instructions Bengal is indebted for the various beautiful founts of the Bengalee, Nagree, Persian, Arabic and other characters which have been gradually introduced into the different printing establishments".

জর্জ স্মিথ মিশনারীদের ১৮০৭ সনের একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে—

"By his (Panchanon's) assistance we created a letter-foundry; and although he is now dead, he had so fully communicated his art to a number of others, that they carry forward the work of type-casting, and even of cutting the matrices, with a degree of accuracy which would not disgrace European artists".

এই কারুশিল্পীদলের পুরোভাগে তখন মনোহর। ১৮০৭ সনের মধ্যে ও'রা যেসব হরফ তৈরি করেছেন বিবরণে তার কথাও আছে। যথা : তিন প্রস্থ বাংলা, নতুন এক প্রস্থ নাগরী, নতুন আরও এক সাট ওড়িয়া,

মারাঠী ইত্যাদি। ও'রা জানাচ্ছেন—আরও তিন প্রস্থ হরফ চাই আমাদের, —ব্রহ্মদেশীয়, তেলিঙ্গা এবং গুরুমুখী। তাছাড়া চীনা হরফের প্রশ্নটি তো আছেই। জর্জ স্মিথ লিখেছেন— "Panchanon's apprentice, Monohar, continued to make elegant founts of types in all Eastern languages for the mission and for sale to others for more than forty years. . . ."

মিশনারীদের কাগজ **সত্যপ্রদীপ** থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে মনোহর সম্পর্কে বলা হয়েছে—

• "তাঁহার (পঞ্চাননের) মরণান্তর জামাতা মনোহর মিস্ত্রী তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়া শ্বশুরের তুল্য বিজ্ঞ ও গুণবানপ্রযুক্ত ন্যূনাধিক পঞ্চদশ ভাষার অক্ষর ক্ষোদন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে সুকঠিন চত্বারিংশৎ সহস্র অক্ষর ঘটিত চীন ভাষার অক্ষর কাষ্ঠে ক্ষোদন করেন। এই মনোহর মিস্ত্রী আপনার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া তাঁহাকে স্বীয় কর্ম্ম শিক্ষা করাইয়াছিলেন এবং ১২৪৫ সালে শ্রীরামপুরে যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়া বৎসরে ২ পাঁজিকা ও নানা বাঙ্গালা, ইংরেজি নানা পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিতেন। তিনি ১২৫৩ সালে লোকান্তরগত হন...।"

চীনা ভাষার অক্ষর কিন্তু কাঠে নয়, ধাতুতেই তৈরি করা হয়েছিল। অবশ্য কলকাতা থেকে চীনা মিস্ত্রি নিয়ে প্রথমে চেষ্টা করা হয়েছিল কাঠের হরফ তৈরি করতে। পিয়ার্স কেরী এবং জে. সি. মার্সম্যান তাঁদের শ্রীরামপুরের ইতিহাসে সে-বিবরণ পেশ করেছেন। চীনা ভাষায় জসুয়া মার্সম্যানের গসপেল-এর যে অনুবাদ ১৮১৩ সনে প্রকাশিত হয় সেটি চলনশীল ধাতব-হরফেই ছাপা। তবে "সত্যপ্রদীপ"এর মনোহর সম্পর্কিত অন্যান্য সংবাদগুলো নিশ্চয়ই মূল্যবান। মনোহর সম্ভবত এদেশের শ্রেষ্ঠতম হরফশিল্পী।

মিশনারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংসর্গ সত্ত্বেও মনোহর কিন্তু শেষ পর্যন্ত পঞ্চাননের মতোই নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। জর্জ স্মিথ লিখেছেন— ১৮৩৯ সনে রেভাঃ জেমস কেনেডি দেখেছেন—দেওয়ালে তাঁর ইষ্টদেবতার ছবি ঝুলিয়ে মনোহর মেঝেয় বসে হরফের ছাঁচ তৈরি করছেন, কিংবা বাইবেল ছাপবার হরফ। স্মিথ একই ভাবে কাজ করতে দেখেছেন মনোহরের উত্তরাধিকারীকে। সম্ভবত মনোহর-তনয় কৃষ্ণচন্দ্রকে।

"বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা'য় মুহম্মদ সিদ্দিক খান লিখেছেন—"বাংলা হরফ কর্তনে মনোহরের অতুলনীয় শিল্পনৈপুণ্যের নমুনা আজও কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের অধিকারে রয়েছে।" ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে তিনি মনোহরের কাটা হরফ এবং পাঞ্চ-এর কিছু নমুনাও প্রকাশ করেছিলেন। ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সেসব স্মারকচিহ্ন এখন কোথায় আছে কে জানে! তবে মনোহর যে এখানেও যাতায়াত করতেন তার ইঙ্গিত রয়েছে শম্ভুচন্দ্রের নোটবইয়ে।

তিনি লিখেছেন—কেরী-পুত্র ফেলিক্স ব্রহ্মদেশ থেকে ফিরে এসে মনোহর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে কলকাতায় আসেন। ফেলিক্সের হুকুম ছিল যিনিই দেখা করতে আসুন, কাজের সময় যেন তাঁকে বিরক্ত না-করা হয়। প্রেসের দ্বারপাল অতএব মনোহরের পথ রোধ করে দাঁড়াল। মনোহরের সঙ্গে তার কিছু কথা কাটাকাটি হয়। সোরগোল শুনে ফেলিক্স বেরিয়ে এলেন, মনোহরকে দেখেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। তারপর টানতে টানতে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। মনোহরকে তিনি এটা দেখাচ্ছেন, সেটা দেখাচ্ছেন; একসময় ব্রহ্মরাজের দেওয়া পোশাকটিও পরে দেখালেন। দেখে মনোহর নাকি বলেন—না সাহেব, আমার ভয় লাগে। তোমার আগের পোশাকই পর। আমার চোখে তাই ভাল। ইত্যাদি। শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে মনোহরের সম্পর্ক যে কেমন নিবিড় ছিল এই ঘটনা থেকে তাও অনুমান করা যায়। মনোহর শ্রীরামপুরের সুবর্ণ-যুগের সেরা শিল্পী। মিশন প্রেসে ছাপা সেকালের বইগুলো দেখলে মনে হয় অক্ষর তৈরির কাজে তাঁর তুল্য রূপদক্ষ বুঝি এদেশে আজও জন্মাননি।

সত্যপ্রদীপ অনুযায়ী মনোহর নিজের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন বাংলা ১২৪৫ সালে, অর্থাৎ ১৮৩৮—৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি মারা যান ১৮৪৬—৪৭ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১২৫৩ সালে)। তাঁর ছাপাখানাটি সম্পর্কে সম্প্রতি একজন সন্ধানী (সবিতা চট্টোপাধ্যায়) লিখেছেন—মনোহর মিশনারীদের ছাপাখানায় কাজ করতেন বলে বাইরে কখনও অক্ষর তৈরির কাজে ধাতু ব্যবহার করতেন না। "এই জন্যই কাঠের ছোট ছোট ফলকে অক্ষর নির্মাণ করিয়া বাড়িতে ছাপাখানা খুলিয়াছিলেন।" এটা

অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। মনোহরের ছাপাখানার নাম ছিল—চন্দ্রোদয় প্রেস। চন্দ্রোদয় যন্ত্রে ছাপা অনেক বই আমরা দেখেছি। কিছু কিছু পুরানো পঞ্জিকা দেখার সুযোগও পেয়েছি। কিন্তু কাঠে ছাপার কোনও নমুনা আমাদের চোখে পড়েনি। মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসে অবশ্য কাঠের হরফ বা ব্লক-যোগে বই ছাপার কাহিনী অজ্ঞাত নয়। শ্রীরামপুরে চীনা হরফে বই ছাপাতে গিয়েও ও'রা নাকি প্রথমে ব্লক-প্রিণ্টিংয়েরই চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধাতুর হরফের কাছেই আত্মসমর্পণ করেন। তবে কাঠের হরফ একেবারে অজানা ছিল তা নয়। বই কিংবা সংবাদপত্রের শিরোনাম সেকালে অনেক সময় কাঠের ব্লকে ছাপা হতো,—এখনও কিছু কিছু হয়। কিন্তু বাংলায় কাঠের হরফে পুরো একখানা বই বা পঞ্জিকা ছাপার কাহিনী আমাদের মনে হয় গুজব। এই গুজবকে সত্য বলে গ্রহণ করা হয়েছিল "বিশ্বকোষে"র পাতায়ও। ও'রা লিখেছেন—হলহেডের ব্যাকরণ কাঠের হরফে ছাপা। সেটা যে ভুল আজ আর তা জানতে কারও বাকি নেই। মনোহরের পঞ্জিকা সম্পর্কেও নির্দ্বিধায় বলা চলে—ভুল। কাঠের হরফ সম্পর্কে আমরা সজনীকান্ত দাসকেই পুরো-পুরি সমর্থন করি। **বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে** তিনি লিখেছিলেন—"যেদিন হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সূত্রপাত (১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে) হইয়াছে, সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত একদল পণ্ডিত একটি মোটা ভুল করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের ধারণা, গোড়ার দিকে কাঠের অক্ষরে বাংলা বই ছাপা হইয়াছিল। এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা মুদ্রিত পুস্তক ও সেই সম্পর্কে ইতিহাসাদি আলোচনা করিয়া আমরা নিঃসংশয় হইয়াছি যে, সেকালের বাংলা ভাষায় একটি পুস্তকও কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত হয় নাই।"

মনোহর প্রসঙ্গ অতঃপর এখানেই ইতি।

উৎসাহী পাঠক মনোহর-সংক্রান্ত এইসব খবর পাবেন জন ক্লার্ক মার্সম্যান, পিয়ার্স কেরী এবং জর্জ স্মিথ লিখিত মিশনারী-কাহিনী তিনটি ছাড়াও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত **সংবাদপত্রে সেকালের কথা** (২য় খণ্ড) এবং সজনীকান্ত দাসের **বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস** বইটিতে। সবিতা চট্টোপাধ্যায় লিখিত গ্রন্থটির নাম—**বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক, ১৯৭২।**

৩৪। সবিতা চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ কৃতিত্ব তিনি পঞ্চানন কর্মকারের একটি বংশপীঠিকা সংগ্রহ করেছেন। সেটি উদ্ধৃতিযোগ্য।

"পঞ্চানন কর্মকারের বংশপীঠিকা
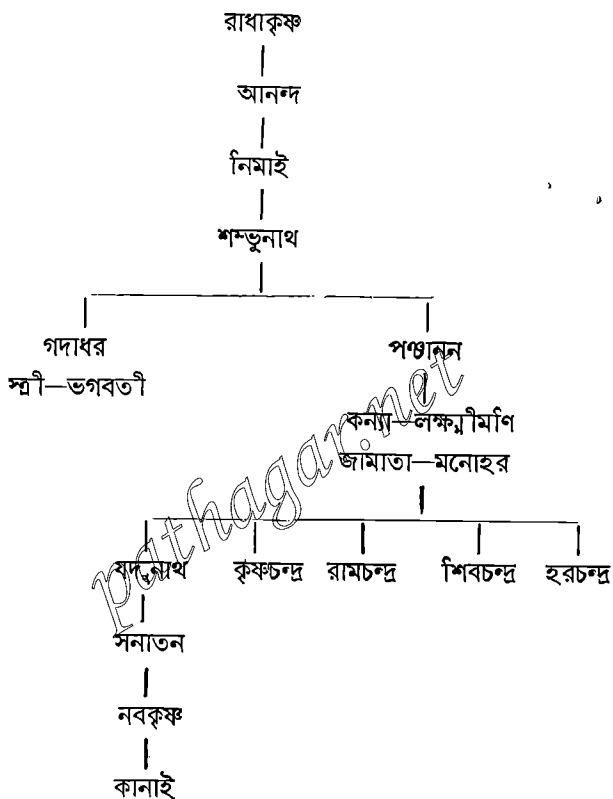
(ইঁহারা ছয় ভাই, সকলেই বর্তমান রহিয়াছেন)"

এই পরিবারের সঙ্গে আমরাও যোগাযোগ করি। যাচাই করে দেখা গেছে পীঠিকাটি যথাযথ। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গত পঞ্চাননের পারিবারিক ইতিবৃত্তও কিছু পরিবেশন করেছেন। তিনি লিখেছেন— "পঞ্চানন কর্মকারের আদি নিবাস হুগলি জেলার জিরাট বলাগড় গ্রামে। জিরাটে এখন যেখানে আশুতোষ স্মৃতিমন্দির, তাহারই নিকটস্থ চারা-

বাগানে ইঁহাদের আদি বাস্তুভিটা ছিল বলিয়া পঞ্চাননের জ্যেষ্ঠভ্রাতার বংশধরেরা নির্দেশ দিতেছেন। পৈত্রিক সম্পত্তি লইয়া ভ্রাতৃবিরোধের ফলে পঞ্চাননের পিতা শম্ভুনাথ বলাগড় হইতে বংশবাটিতে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। পঞ্চানন বাঁশবেড়ে হইতে শ্রীরামপুর আসেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতাকেও আনেন। তদবধি এই পরিবার শ্রীরামপুরেই আছেন। পঞ্চাননের জামাতা মনোহরের বংশধরেরাও এখানেই বসবাস করিতেছেন। অনেকে মনে করেন পঞ্চানন ত্রিবেণীর অধিবাসী ছিলেন, ইহা ঠিক নহে।

ইঁহারা জাতিতে কর্মকার, পেশায় লিপিকর ও উপাধি মল্লিক। ইস্পাত, লোহা ও তামায় লিপিকরণে ইঁহাদের বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতা ছিল। তৎকালে অস্ত্রশস্ত্রে নামাঙ্কন ও তাম্রপটে দানপত্রাদির উৎকীর্ণ-করণের জন্য রাজদরবারে বেতনভোগী 'লিপিকর' নিযুক্ত থাকিতেন, ইহা ব্যক্তি ও পরিবারগত পেশাও ছিল। এই সূত্রেই পঞ্চাননের কোনও পূর্বপুরুষ নবাব আলিবর্দীর আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। 'মল্লিক' উপাধি আলিবর্দী প্রদত্ত। এই বংশের কেহই বর্তমানে পূর্বপুরুষের জীবিকা গ্রহণ করেন নাই। মুদ্রণ-শিল্পেও কেহ কাজ করিতেছেন না। ইঁহারা সকলেই 'মল্লিক' উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন।"

বংশপীঠিকাটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—"পঞ্চানন কর্মকারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার যে-বংশ এখনও শ্রীরামপুরে বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের বৃদ্ধপুরুষের প্রমুখাৎ এই বংশের একটি বংশতালিকা পাইতেছি। বংশ-পীঠিকাটি নিম্নরূপ (আগেই উদ্ধৃত)। বক্তা—শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক। বয়স—৭২ বৎসর। রামচন্দ্র পঞ্চাননের প্রপৌত্র। ইঁহার পিতা অধরচন্দ্রের নামে 'অধর ফাউণ্ড্রি' একসময় কলিকাতায় প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল।"

শ্রীরামপুর থেকে ইন্দিরা দাস নামে একজন পত্রলেখিকা আনন্দবাজার পত্রিকার 'সম্পাদক সমীপেষু' বিভাগে কিছু তথ্য পেশ করেন। (৬ মে, ১৯৭৬) তাতে তিনি লেখেন—"পঞ্চানন কর্মকারের পিতার নাম নিমাই। (নিমাই নয়, হবে শম্ভুনাথ)। তিনি ত্রিবেণী নিবাসী ছিলেন। আলিবর্দী খাঁর নিকট তিনি 'মল্লিক' উপাধি প্রাপ্ত হয়ে চন্দননগরে আসেন। পঞ্চাননের জন্ম হয় জিরাট বলাগড়ে।" ত্রিবেণীর কথা অতএব পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এঁর তথ্য সূত্রও কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র কর্মকার।

ইন্দিরা দাস রচিত বংশ-তালিকায় বিশেষ গোলমাল। তবে তাঁর পত্রে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য আছে। যেমন, তিনি জানাচ্ছেন—"পঞ্চাননের জামাতা মনোহরের চার পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র প্রেস চালনা করতেন। (কৃষ্ণচন্দ্র আসলে মনোহরের দ্বিতীয় পুত্র।) তাঁদের প্রেসের নাম ছিল 'চন্দ্রোদয় প্রেস'। এই প্রেসটি ১৮৪১ সালে স্থাপিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র অল্প বয়সে মারা যান। শুনেছি তাঁর পুত্র সন্তান ছিল না। কৃষ্ণচন্দ্রের অন্য ভাইদের নাম—শিবচন্দ্র, হরচন্দ্র ও রামচন্দ্র। (আরও একজন ছিলেন—যদুনাথ)। এঁদের মধ্যে শিবচন্দ্র ব্লক তৈরি করতেন; রামচন্দ্র ছেনী প্রস্তুত করতেন। রামচন্দ্র স্বয়ং মনোহরের কাছে ছেনী প্রস্তুত প্রণালী ১২৫৫ বঙ্গাব্দে শিখেছিলেন। কিন্তু এঁদের বংশধরেরা এই কাজ বেশি দিন চালাতে পারেননি। সম্ভবত প্রতিযোগিতায় টিঁকতে না পেরে প্রেসটিই বন্ধ করে দেন। এই প্রেসটি ছিল বর্তমান বঙ্কিম সরণী ও ধর্মতলার মোড়ে। এঁদের বাড়িও ঐ প্রেসের নিকটেই।"

সন তারিখের ব্যাপারে আমাদের মনে হয় "সত্যপ্রদীপ"ই বেশি নির্ভরযোগ্য। সবিতা চট্টোপাধ্যায় বলেছেন মনোহরের মৃত্যু ১৮৫৩ সনে। অথচ, কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে ১৮৫০ সনের মে মাসে। মনোহরের মৃত্যু বাংলা ১২৫৩ সালে, অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৪৬-৪৭ সনে। সুতরাং ইন্দিরা দাস যখন বলেন রামচন্দ্র ১২৫৫ সনে মনোহরের কাছে হরফ তৈরির কাজ শিখেছিলেন, তখন তিনিও ভুল বলেন। তবে এইসব আলোচনায় যে-বিষয়টি স্পষ্টতর তা হচ্ছে এই—পারিবারিক প্রেস এবং পঞ্জিকা দুইয়েরই সূত্রপাত মনোহরের আমলে, শ্রীবৃদ্ধি কৃষ্ণচন্দ্রের হাতে। তাঁর মৃত্যুর পর প্রেস এবং পঞ্জিকা বেশি দিন চলেনি একথা ঠিক নয়। এ-বিষয়ে সবিতা চট্টোপাধ্যায় যা বলেছেন সেটাই সত্য। তিনি লিখেছেন—"তাঁহাদের যে ছাপাখানা হইতে পঞ্জিকা ছাপা হইত তাহার নাম 'চন্দ্রোদয় প্রেস'। ছাপাখানাটি ১৫।১৬ বৎসর পূর্বে বিক্রী হইয়া যায়, ক্রয় করেন অধ্যক্ষ পঞ্চানন সিংহ।"

এবার টাইপ-ফাউণ্ড্রি প্রসঙ্গ। আনন্দবাজারে প্রকাশিত চিঠিতে ইন্দিরা দাস লিখেছেন—"অধর কর্মকারের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র কর্মকার। তাঁহার গৃহে পঞ্চাননের আদি টাইপ ফাউণ্ড্রিটি আমি দেখেছি। সেটি ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পঞ্চাননের মৃত্যুর পর অধর তা

প্রাপ্ত হন। অধরের কর্মশালাটি যে সময় আমি তাঁদের বাড়িতে ১৯৬৭—৬৮ সালে গিয়েছিলাম, তখন রামচন্দ্রের পুত্র সুনীলকৃষ্ণ পরিচালনা করতেন।"

অধর টাইপ ফাউণ্ড্রিটি আমরাও দেখেছি। বেশ কিছুকাল বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি আবার সেটিকে চালু করার চেষ্টা চলছে। ওঁদের কাছে এখনও রয়েছে আদ্যিকালের হরফ ঢালাইয়ের নানা সাজসরঞ্জাম। কাগজেপত্রে সর্বত্র বলা হয়েছে ফাউণ্ড্রিটি স্থাপিত হয় ১৮০৯ সনে। তার আগেই পঞ্চাননের মৃত্যু। সুতরাং, এটি পঞ্চানন-প্রতিষ্ঠিত এমন বলা যায় না। দ্বিতীয়ত, অধরচন্দ্র পঞ্চাননের সমসাময়িক নহেন, মধ্যে অন্তত এক পুরুষের ব্যবধান। এই বংশ আসলে পঞ্চাননের ভাই গদাধরের বংশ। তবে প্রতিষ্ঠাতা যিনিই হোন না কেন, অধর টাইপ ফাউণ্ড্রি অবশ্যই এই রাজ্যে অন্যতম প্রাচীন হরফ তৈরির কারখানা। এই কারখানার খ্যাতি একসময় আশপাশের রাজ্যগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। "বিশ্বকোষ"-এ বলা হয়েছে—"মনোহরের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র উৎকৃষ্ট ছাঁদের ডাইস প্রস্তুত করিয়া বাঙ্গালা পঞ্জিকা, পুস্তক ও ছবি ছাপিতে আরম্ভ করেন। ঐ বংশের অন্যতম কারিগর অধরচন্দ্র কর্ম্মকারের কার্য্যালয়ের ঢালাই বর্জাইস, স্মলপাইকা, পাইকা ও ইংলিশ ছাঁদের হরফগুলি সর্বাঙ্গ সুন্দর। বিভিন্ন মুদ্রাকরগণ উক্ত ছাঁদ সমূহের "Electro matrix" প্রস্তুত করিয়া কার্য্য চালাইতেছেন।"

হরফ-তৈরিতে অধরের খ্যাতি অতএব প্রশ্নাতীত। পঞ্চাননের ভাইয়ের বংশধররা এখনও এ-কাজে আগ্রহ বজায় রাখতে পেরেছেন প্রায় দু'শ বছর পরে এটা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

দ্রষ্টব্য : **বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক**—সবিতা চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭২ ; **বিশ্বকোষ** (পঞ্চদশ ভাগ)—নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত, ১৩১১।

৩৫। দ্রষ্টব্য : **হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ,** ১ম খণ্ড, —সুধীরকুমার মিত্র, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬২।

৩৬। দ্রষ্টব্য : *Bengali Literature in the Nineteenth Century*—S. K. De ; **বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস**—সজনীকান্ত দাস ; **বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা**—মুহম্মদ সিদ্দিক খান।

৩৭। লঙ সাহেব তাঁর চৌদ্দশ' বাংলা বইয়ের তালিকায় (১৮৫৫)

সিক্ষ্যাগুরু ছাপার কৃতিত্ব শ্রীরামপুরকে অর্পণ করেই ক্ষান্ত হননি, দ্বিতীয় এক সালতামামি লিখতে বসে (১৮৫৯) সোজাসুজি লিখেছেন —মফঃস্বলে ছাপাখানার কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় শ্রীরামপুরের কথা, যেখানে ১৭৯৩ সন থেকে চলছে ছাপার কাজ। তাঁর এই মতকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছেন সুকুমার সেন মশাই। তিনি এক প্রবন্ধে "সিক্ষ্যাগুরু" প্রসঙ্গে লিখেছেন—"There is no reason to believe, as some have done, that it was printed at a Calcutta Press". তবে কি এটি শ্রীরামপুরেই ছাপা? এবিষয়ে সজনীকান্ত দাসের বক্তব্য—"কিন্তু শ্রীরামপুরে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে কোনও মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই।...সুতরাং সম্ভবতঃ পুস্তকটি কলিকাতার কোন ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়া থাকিবে।" আমাদেরও তাই ধারণা।

দ্রষ্টব্য : *A Descriptive Catalogue of 1400 Bengali Books and Pamphlets*—Rev. J. Long, 1855 ; *Returns relating to the publishing in the Bengali Language in 1857 etc.*—Rev. J. Long, 1859 ; *Early Printers and Publishers of Calcutta* —Sukumar Sen, *Bengal Past and Present,* Janu-June, 1968, Part—I, Serial No.—163. **বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস**— সজনীকান্ত দাস।

৩৮। তখনকার কলকাতায় ছাপাখানার নামধাম এবং ক্রিয়াকলাপের বিবরণ পাওয়া যাবে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা"র (২য় খণ্ড) পাতায়। ছাপার যন্ত্র দর্শনে মদনবাটির স্থানীয় দর্শকদের এই প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন পিয়ার্স কেরী তাঁর কেরী-জীবনীতে।

৩৯। "বটতলায় প্রথম ছাপাখানা করেন বিশ্বনাথ দেব। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে—হয়ত দুই এক বৎসর পূর্বেই এই ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছিল। এই সময় বাংলা ছাপিবার প্রেস কলিকাতায় ছিল অন্তত পাঁচটি—মিশন রো-এ গভর্ণমেণ্ট গেজেট প্রেস, বৌবাজারে ফেরিস কোম্পানির প্রেস, লালবাজারে হিন্দুস্থানী প্রেস, চোরবাগানে হরচন্দ্র রায়ের বাঙ্গালি প্রেস এবং পটলডাঙ্গায় লল্লুলালের "সংস্কৃত" প্রেস

(যাহার প্রিণ্টার ছিল মদনমোহন পাল।)...তবে লঙ লিখিয়াছেন যে, ১৮২১ খৃীষ্টাব্দে চারিটি মাত্র দেশী লোকের প্রেস চালু ছিল। একথা সত্য হইলে ১৮২১ খৃীষ্টাব্দে দেশী লোকের অন্তত চারিটি প্রেস ছিল—হিন্দুস্থানী প্রেস, বাঙ্গালি প্রেস, সংস্কৃত প্রেস ও বিশ্বনাথ দেবের প্রেস।..." **বটতলার বেসাতি**—সুকুমার সেন, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫৫।

সুকুমার সেন মুদ্রণ সম্পর্কিত আর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন—

"In North Calcutta the first printing press and publishing house, so far as I know, was Biswanath Dev's at Sobhabazar. It was a good press with old fashioned types and its publication were varied, from school arithmatic (1818) to Kavi Kankan's Chandi (1823) edited by Ramjay Vidhyasagar"—*Early Printers and Publishers in Calcutta*—Sukumar Sen, *Bengal past and present,* January-June, 1968.

৪০। বাবুরামের ছাপাখানা সম্পর্কে সুকুমার সেন উল্লেখিত ইংরাজী প্রবন্ধটিতে লিখেছেন—

"A press for printing Sanskrit works in Nagri types and Sanskrit and Bengali works in Bengali types, were established, presumably under the patronage of Colebrooke and other scholars at Kidderpore. The owner was a Baburam, a brahmin from Mirzapore. The Amarkosa, edited by Colebrooke was printed at this press in 1807....The press was later taken over by Lallulal, a Hindustani teacher at the college of Fort William and better known as the father of Hindi Khariboli prose. The first book of old Hindi literature was published by Lallulal in 1815. It is the Vinaypatrika of Tulsidas...."

বাবুরাম একজন সফল মুদ্রাকর। সরকারী প্রেসের সুপারিনটেনডেণ্ট ১৮০০ সন নাগাদ কেরীকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন কলকাতার

ছাপাখানাগুলোর পরিচালকরা দু'হাতে টাকা রোজগার করছেন। তাঁদের কারও কারও আয় কাউন্সিলের মেম্বারদের আয়ের সমান। (ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৫) বাবুরামও নাকি ছাপাখানার দৌলতে ক'বছরের মধ্যে কয়েক লাখ টাকার মালিক হয়েছিলেন।

তবে মুদ্রাকর হিসাবেও বাবুরাম একজন স্মরণীয় ব্যক্তি। তাঁর নানা বৈশিষ্ট্য। যাঁরা ও'র মুদ্রিত বই ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন তাঁরা বলেন—নামপত্রে কখনও তিনি "বাবুরাম ব্রাহ্মণ", কখনও—"বিদ্বান ব্রাহ্মণ কুলে অলংকার স্বরূপ বাবুরাম", কখনও "সরস্বতীর বরপুত্র বাবুরাম", কখনও বা "বিষ্ণুভক্ত বাবুরাম"। সংস্কৃতে এই সব অলংকারের ঝংকার নিশ্চয়ই পাঠকের কানে কর্ণামৃতের মতো।

তাঁর মুদ্রিত বইয়ের পাতায়ও অলংকারের ছড়াছড়ি।

সংস্কৃত বইয়ে পশ্চিমী ঢঙে নামপত্র বাবুরামের আর এক অবদান। সুকুমার সেন লিখেছেন—"কলিকাতার দেশীয় প্রকাশকরা প্রথমে পুথির অনুসরণে ছাপা বইয়ে নামপৃষ্ঠা দিতেন না। বইয়ের সর্বশেষে থাকিত মুদ্রণ-কাল (পুথির পুষ্পিকায় যেমন থাকে) এবং ক্বচিৎ মুদ্রণযন্ত্রের নাম (পুথি লেখকের নামধামের মত)। যেমন, রামমোহন রায়ের তলবকার উপনিষদের শেষে—'শকাব্দা ১৭৩৮ ইংরাজী ১৮১৬।১৭ আষাঢ় ২৯ জুনেতে ছাপানো গেল', এবং কঠোপনিষদের শেষে—'ইতি সন ১২২৪ সাল তারিখ ১৬ ভাদ্র। বাঙ্গালি প্রেস।' পুথি লেখক যেমন পুথির পুষ্পিকার বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি দোষ স্খালনের জন্য পাঠকের ক্ষমাভিক্ষা ফর্মুলা দিতেন, 'জীত ঘাটি থাকে দোষ ক্ষমিবেন মোর' ইত্যাদি, এই সময়ে ছাপা বইয়ের মুদ্রাকরও তেমনই অনেক সময় তাহাই করিতেন।"

বাবুরাম কিন্তু বলতে গেলে প্রথম থেকেই এক ধরনের নামপত্র ব্যবহার করে আসছেন। তবে সংস্কৃত শ্লোকে। তাতে লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশকাল সব তথ্য রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ১৮০৮ সনে "কোলব্রুক সাহেবের আজ্ঞায় প্রস্তুত এবং ছাপা" **অভিধান-চিন্তামণি**-র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তার ছয় ছত্রের সংস্কৃত নামপত্রে জ্ঞাতব্য সব তথ্যই পরিবেশন করেছেন তিনি।

বাংলা বইয়ে পদ্যে পুষ্পিকা রচনার ধারা বেশ কিছুকাল চলেছিল।

তবে স্বদেশী প্রকাশকদের মধ্যে ইংরেজী কায়দায় নামপত্র প্রকাশে অগ্রণী বোধহয় এই বাবুরাম ব্রাহ্মণ।

ছাপাখানার দিকে এদেশের মানুষের আকর্ষণের কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন ক্যাথারিন ডিল তাঁর ছোট্ট বইটির ভূমিকায় :

"People unaquainted with the mechanical devices of Western Man quickly learned to operate the machines ; to set the types ; to produce booklets, pictures, hard cover books ; and journals in all sorts of languages and dialects which were communicated in many different characters". . . . *Early Printers and Publishers in Calcutta*—Sukumar Sen, *Bengal Past & Present,* January—June 1968 ; *Early Indian Imprints,* (An exhibition from the Carey Historical Library of Serampore)—Katharine Smith Diehl, 1962 ; *Early Indian Imprints*—Katharine Smith Diehl, 1964 ; **বটতলার বেসাতি**—সুকুমার সেন, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫৫ ; **গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য,** সাহিত্য সাধক চরিতমালা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪১। "সমাচার দর্পণ"-এর উদ্ধৃতিগুলোর জন্য দ্রষ্টব্য : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত **সংবাদপত্রে সেকালের কথা,** (২য় খণ্ড)।

৪২। **বঙ্গদূত,** ১৯ ডিসেম্বর, ১৮২৯। "সংবাদপত্রে সেকালের কথা"য় (১ম খণ্ড) উদ্ধৃত। তাছাড়া দ্রষ্টব্য : **কলিকাতা শহরের ইতিবৃত্ত,**—বিনয় ঘোষ, ১৯৭৬।

৪৩। ১৮৩০ সনে প্রকাশিত এই বইটির মুদ্রণ পারিপাট্য এখনও চমৎকৃত করে। ১৮২৭ সনের ২৫ আগস্ট **সমাচার দর্পণে** প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল—

"সটীক শ্রীমদ্ভাগবত ৩২ টাকা।—চন্দ্রিকা যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়স্য বিজ্ঞাপনমিদং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের অপ্রাপ্তি দূর করণার্থে ছাপা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তুলাত কাগজে প্রাচীন ধারামত পুস্তকের পাত করিয়া বড় অক্ষরে মূল ক্ষুদ্রাক্ষরে শ্রীধর স্বামীর টীকা এই

প্রণালীতে সংশোধিত করিয়া চন্দ্রিকাযন্ত্রে ব্রাহ্মণ দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করাইব ইহার মূল্য স্বাক্ষরকারি গ্রাহকের নিমিত্তে ৩২ টাকা তদ্ভিন্নান্য গ্রাহক ৫০ টাকা স্থির করিয়াছি...কিন্তু যদি কলিকাতা হইতে দশ ক্রোশের অধিক দূর হয় তবে গ্রন্থ প্রেরণ করণজন্য যাহা ব্যয় হইবেক তাহা দিতে হইবেক ইতি।”

বইটির ছাপা শুরু হয়েছিল ১৭৪৯ শকের বৈশাখে, ছাপা শেষ হয় ১৭৫২ শকের বৈশাখে। অর্থাৎ ছাপতে সময় লেগেছিল পুরো তিন বছর। পৃষ্ঠা সংখ্যা—“পাঁচ শত ত্রিশ পত্র”। প্রকাশের পর ১৮৩০ সনের ১০ জুলাই এক বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল—স্বাক্ষরকারী গ্রাহকদের নিমিত্ত এক পুস্তকের মূল্য—বত্রিশ টাকা। “ঐ গ্রন্থের ডোর পাটার ব্যয়”—১ টাকা। আর নতুন গ্রাহকদের জন্য মূল্য ধার্য হয়েছে ৪০ টাকা।

সুকুমার সেন উল্লেখিত **বটতলার বেসাতি** প্রবন্ধে লিখেছেন—“পুঁথির আকারে খোলা পাতায় বাংলা বই ছাপা কে শুরু করিয়াছিলেন জানি না। এই ভাবে ছাপা সবচেয়ে পুরানো বই ১৭৩৭ শকাব্দে (অর্থাৎ ১৮১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে) ছাপা বৈষ্ণব জীবন কাব্য, আনন্দচন্দ্র দাসের ‘জগদীশ-চরিত্র বা জগদীশ বিজয়’।” অন্যত্র তাঁর উল্লেখিত ইংরাজী প্রবন্ধটিতে **নরোত্তম বিলাস** (১৮১৫) নামে আরও একখানি বইয়ের কথা তিনি বলেছেন যা পুঁথির স্টাইলে ছাপা। মজার কথা এই, বটতলায় এখনও কিন্তু কোনও কোনও ধর্মপুস্তক ছাপা হয় পুঁথির আদলে।

৪৪। ছাপাখানাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা অনেক সমাজেই দেখা গেছে। সংঘাত কখনও রাষ্ট্রীয়, কখনও সামাজিক। সে-লড়াইয়ে ছাপাখানার বিজয় কাহিনী রোমাঞ্চকর। উৎসাহী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন—*The Book : The Story of Printing and Bookmaking*—Douglas C. McMurtrie, 1957 ; *The Battle of the Books in its Historical setting*—A. E. Burlinghame, 1920 ; *The Sociology of Literary Taste*—L. L. Schucking, 1945 ; **জনসভার সাহিত্য**—বিনয় ঘোষ, ১৩৬২।

৪৫। এই সংবাদটি **সংবাদপত্রে সেকালের কথা** থেকে সংগৃহীত। ১৮৫৭ সনে মুদ্রিত বাংলা বইয়ের বিবরণে (১৮৫৯) লঙ সাহেব বই দানের সংক্ষিপ্ত বিবরণও পেশ করেছেন। তাঁর হিসাবে সে বছর (১৮৫৭)

৭৭৫০টি বই বাঙালী বাবুরা ছাপিয়েছিলেন বিনামূল্যে বিতরণের জন্য। অন্যতম দাতা বর্ধমানের রাজা, এবং কলকাতার কালীপ্রসন্ন সিংহ। তাছাড়া খ্রীস্টান সংঘগুলোও বিতরণ করে ৭৬৯৫০টি শাস্ত্রীয় পুস্তিকা। লঙ লিখেছেন ওঁরাও ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারছেন বই ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিলি করলে কাগজওয়ালা এবং মুদ্রাকরের সুবিধা হয় বটে, তবে আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় কম। বিনে পয়সায় বই যাঁরা পেতে চান, তাঁরা অনেক সময় কাগজের লোভেই হাত বাড়ান! *Publications in the Bengali Language in 1857*—Rev. J. Long, 1859.

৪৬। উল্লেখিত এই বিবরণটিতে লঙ বাংলা প্রকাশন শিল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে কিছু মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছেন। তিনি লিখেছেন ১৮২০ সনে বাংলা ভাষায় বই ছাপা হয়েছিল ৩০টি। ৫খানির বিষয়বস্তু—কৃষ্ণ, ২টি বিষ্ণু-বিষয়ক, ৪টি দুর্গা, ৩টি কাহিনীমূলক, ৫টি "অশ্লীল"। লঙ বলছেন নাটক, সংগীত, জ্যোতিষ, চিকিৎসাবিদ্যা, রামমোহনের অনুবাদ এবং পঞ্জিকা ছাপা হয়েছিল ১টি করে।

লঙ সাহেবের হিসাবমত ১৮২২ থেকে ১৮২৬ সনের মধ্যে বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে ২৮ খানা। তার মধ্যে তিনখানাকে বাদ দিলে সবই ধর্ম কিংবা পৌরাণিক উপাখ্যান। তাঁর তালিকাটি নির্ভুল, এমন বলা যায় না। কারণ ১৮২২ সনে "সমাচার দর্পণে" শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত বইয়ের যে ফর্দ দেওয়া হয়েছে তাতেই রয়েছে ১৫।১৬ খানা বাংলা বইয়ের নাম। ১৮২৫ সনের ২২ জানুয়ারি ছাপা হয়েছিল কলকাতার নানা ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত বইয়ের তালিকা। তাতেও ২০।২৫টি বইয়ের খবর আছে। সাধারণত একটি ছাপাখানার বার্ষিক অবদান তখন একখানা করে বই। তবে কয়েকটি যন্ত্রালয় রীতিমত প্রকাশক। তাঁরা বছরে ৫।৬ খানা বই উপহার দিচ্ছেন পাঠককে।

লঙ বলেছেন ১৮৫০ সন পর্যন্ত বাঙালী প্রকাশকদের প্রবণতা ছিল হয় ধর্ম, না-হয় আদিরসাত্মক কাব্যাদি প্রকাশের দিকে। শতাব্দীর মাঝামাঝি পৌঁছে প্রকাশনায় নতুন মোড়। ১৮৫২ সনে নতুন বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছিল নাকি ৫০টি। সে তালিকায় যেমন রয়েছে ক্লাইভ কিংবা গ্যালেলিও'র জীবনচরিত, তেমনই রয়েছে শেকসপীয়র এবং রবিনসন ক্রুসোর গল্প। বাঙালী পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গি পালটাচ্ছে

বইকি! ১৮৫৪ সনে বাংলার ইতিহাস, নিউটনের জীবনী সমেত নানা বিষয়ে বেশ কিছু সংখ্যক বই বের হয়। ১৮৫৬ সনে এদেশের পাঠক ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ এবং স্টীম ইঞ্জিন বিষয়েও বাংলায় বই পড়তে দিব্যি আগ্রহী। ১৮৫৭ সনে দেশীয় লোকেদের পরিচালিত ছাপাখানা থেকে বিক্রির জন্য বই ছাপা হয়েছিল ৩২২টি। লঙ সেগুলোকে তালিকাবন্ধ করেছেন এইভাবে—

পঞ্জিকা — ১৯
ইতিহাস এবং জীবনী — ১৫
খ্রীস্টীয় ধর্ম পুস্তক — ৮
নাটক — ৮
শিক্ষাবিষয়ক — ৪৬
আদিরসাত্মক — ১৩
আখ্যান — ২৮
আইন — ৫
হিন্দু পৌরাণিক উপাখ্যান — ৮৫
ধর্ম ও নীতিকথা — ১৯
মুসলমানী বাংলা — ২৩
প্রকৃতি বিজ্ঞান — ৯
সংবাদপত্র — ৬
সাময়িকপত্র — ১২
সংস্কৃত-বাংলা — ১৪
বিবিধ — ১২

মোট — ৩২২ খানা

এই ৩২২ খানা বই এবং পত্রপত্রিকা একুনে ছাপা হয়েছিল মোট ৫,৭১,৬৭০ সংখ্যা। লঙ মনে করেন আসলে সংখ্যাটা কিছু বেশিই হবে। তিনি সে-বছর বিক্রির জন্য ছাপা বাংলা বইয়ের সংখ্যা ধরেছেন ৬ লক্ষ। এর মধ্যে সংস্কৃত এবং আরবি ফার্সি বই ধরা হয়নি। দানের জন্য যে বই ছেপেছেন নানা ধর্মীয় ও বিদ্যা প্রচারণা সভা তাও বাদ। ছাপা হরফের দিকে সাধারণের আগ্রহ যে কীভাবে লাফে লাফে বেড়ে

চলেছে—এই সব খতিয়ানের দিকে এক নজর তাকালে সহজেই তা বোঝা যায়। ১৮৫৭ সনে মুদ্রিত বই এবং পত্র পত্রিকার মোট প্রচার সংখ্যা যেখানে ৫,৭১৬৭০, ১৮৫৩ সনে তা ছিল নাকি ৩,০৩২৭৫! বৃদ্ধির হার, সন্দেহ কী, চমকপ্রদ।

৪৭। **ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়**—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সাহিত্যসাধক চরিতমালা দ্রষ্টব্য।

আদিরসাত্মক বইয়ের প্রতি পাঠকদের আগ্রহ নিয়ে সমাচার দর্পণ কাগজে, (২২ ফেব্রুয়ারি, ১৮২৩) সাং নিশ্চিন্তপুর থেকে জনৈক শ্রীযথার্থবাদিনঃ একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর অভিযোগ শোনার মতো। তিনি লিখছেন—"...সংপ্রতি এই কলিকাতা মহানগরে বিদ্যাসুন্দর ও রতিমঞ্জরী ও রসমঞ্জরী প্রভৃতি আদিরসঘটিত যে ২ গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে তাহা বাবুরদিগের নিকটে আগতমাত্র সমাদর পুরঃসরে মূল্য প্রদানপূর্বক গ্রহণ করিয়া দিবারাত্র তদামোদে আমোদিত হইয়া থাকেন কিন্তু এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তিথিতত্ত্বের অন্তর্ভূত কর্মলোচন নামক এক গ্রন্থ অতি যত্নে ভাষাতে পয়ার করিয়া সংস্কৃত সমেত ৫০০ শত গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন অনেক চেষ্টাতে শতাবধি গ্রন্থ শিষ্টবিশিষ্ট লোকদ্বারা আদৃত হওয়াতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ঋণ শোধ মাত্র হইয়াছে সে গ্রন্থের মূল্য ৷৷৹ আধ টাকার ঊর্দ্ধ নহে। এই গ্রন্থ আধুনিক বাবুজী মহাশয়েরদিগের নিকটে লইয়া গেলে প্রথমতঃ আদিরস জ্ঞানে হস্তে করেন পরে কিঞ্চিৎ দর্শনে রজ্জুজ্ঞানে সর্পধারণ জ্ঞান করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন..." ইত্যাদি।

আদিরসাত্মক বইয়ের কী রকম চাহিদা ছিল লঙ তাঁর উল্লেখিত বিবরণীটিতে সে-বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছেন। এক সংস্করণে সাধারণত বাংলা বই ছাপা হতো পাঁচ শ' কপি করে। কিন্তু আদিরসের একটি বই নাকি এক বছরে বিক্রি হয়েছিল তিরিশ হাজার কপি। দাম ছিল তার চার আনা। পুলিস অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিন জনকে পাকড়াও করে। জরিমানা ধার্য হয় তেরশ' টাকা। ১৮৬৩ সনে ছাপা মুসলমানী বাংলায় লেখা একটি সচিত্র আদিরসাত্মক বই আমরা দেখেছি। তার দাম ছিল কিন্তু পাঁচ টাকা! দ্রষ্টব্য : *Publications in the Bengali Language in 1857,*—Rev. J. Long., 1859.

৪৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত **সংবাদপত্রে সেকালের কথা**-য় (২য় খণ্ড) মানচিত্র এবং চিত্রের আরও কয়েকটি বিজ্ঞাপন রয়েছে। প্রকাশনার উদ্যোগ হিসাবে ঘটনাগুলো উল্লেখযোগ্য।

৯ জুলাই, ১৮২৫ : "কলিকাতার নক্‌শা।—অল্প দিবস হইল কলিকাতায় মেজর সক সাহেব কর্তৃক কলিকাতা নগরের এক নক্সা প্রস্তুত হইয়াছে ভারতবর্ষের মধ্যে এ অতিপ্রধান কর্ম হইয়াছে।..." ১০ সেপ্টেম্বর ১৮২৫ঃ কাশীর নকশা।—শ্রীযুত প্রিনসেপ সাহেব কাশীধামে গমন পূর্ব্বক ঐ স্থানের প্রত্যেক রাস্তা ও গলি ও অট্টালিকা এবং কাশীতল বাহিনী গঙ্গাপ্রভৃতির নকশা করিয়া ইংগ্লণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সেখানে পাথুরীয়া ছাপাখানাতে ঐ নকশা ছাপা হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে তাহার প্রত্যেক নকশার মূল্য ১২ বার টাকা।..." ১৫ অক্টোবর, ১৮২৫ : "নূতন ছবি। কলিকাতার পাথরীয়া ছাপাখানাতে খাজরী অবধি কানপুর পর্যন্ত গঙ্গানদীর এক নকশা ছাপান গিয়াছে এবং গঙ্গার উভয়তীরে যত গ্রাম আছে সে-সকল তাহাতে লিখিত আছে...ইহার দ্বারা পথিক লোকেরদের যথেষ্ট উপকার হইবেক"। ২৬ মে, ১৮৩৮ : "আমরা বর্তমান সপ্তাহে হিন্দুকালেজের এক শিক্ষক শ্রীযুত ভুবনমোহন মিত্র কর্তৃক এটলাস অর্থাৎ দেশের নক্সা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা আমাদিগের কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে ঐ এটলাসে ২৫ খানা ম্যাপ আছে আর ইহা জেনেরেল কমিটির অন্তর্গত যত পাঠশালা হইয়াছে তাহার ব্যবহারোপযুক্ত হইয়াছে। গত মালিস্‌ সাহেব এই পুস্তক প্রস্তুতকারক এবং ইহার শিল্পী এই উভয়কেই আমরা ধন্যবাদ করি"।

অন্যের হাত ধরে চলেই খুশি থাকতে পারছেন না এ-দেশের মানুষ, নিজেদের চোখে দুনিয়ার দিকে তাকাতে শিখছেন তাঁরা। জানা যাচ্ছে ভূ আর ভারত হুবহু এক নয়।

১৮৫৯ সনে লঙ সাহেব খেদ প্রকাশ করেছেন—কলকাতায় মুদ্রিত ছবি বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। আগ্রা অঞ্চলে লিথোগ্রাফিক প্রেসের অভাব নেই, কিন্তু কলকাতায় বইপত্রে ছবির ব্যবহার খুবই কম। এই তথ্যের সমর্থন মেলে ত্রৈলোক্যনাথ মুখার্জির বিবরণেও। তিনি লিখেছেন (১৮৮৮)—লিথোগ্রাফিক পদ্ধতিতে বইপত্র ছাপার কাজ বেশি চলে উত্তর ভারত এবং পাঞ্জাবে। তার কারণ অবশ্য পারসিক লিপির আকার-প্রকার।

সে-লিপি ওই পদ্ধতিতেই ছাপতে সুবিধা। লিথো-ছবি সম্পর্কে ত্রৈলোক্যনাথ জানিয়েছেন—কলকাতায় একটি আর্ট স্টুডিও রাশি রাশি ছবি ছেপে বিক্রি করছে। সে-সব ছবি ইউরোপীয় শৈলীর নকল, শিল্প-গত মান মোটেই উন্নত নয়। ছাপার পর ছবি রঙ করা হতো হাতে। হালে অবশ্য ক্রম-লিথোগ্রাফিক প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। কলকাতার আর্ট স্টুডিওর ছবির অনুকরণে বিলাত থেকে রঙীন ছবি পাঠানো হচ্ছে এ-দেশে। দাম খুবই সস্তা, স্থানীয় ছবির দামের দশ ভাগের একভাগ। তবে বিলাতে ছাপা ভারতীয় দেবদেবীর রঙীন ছবির দিনও ফুরালো, এখন আসছেন পর্সেলিনের দেবদেবীরা। তবে ক্যাথারিন ডিল শ্রীরামপুরে কেরী-লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত পুঁথিপত্রের যে নির্বাচিত তালিকা প্রকাশ করেছেন তাতে কিন্তু বেশ কয়েকটি লিথোগ্রাফিক প্রেসের হদিশ মেলে। সেগুলো চালু ছিল ১৮২৪ থেকে ১৮৫০ সনের মধ্যে। তার আগেই ১৮২২ সনে ফরাসী শিল্পীদের উদ্যোগে সার্থক লিথো-গ্রাফিক চিত্র প্রকাশের খবর পাওয়া যায় ক্যালকাটা জার্নাল-এ (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮২২)। তাতে বলা হয়েছে বার বার বিফল হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত মিঃ বেলনস (Belnos) এবং দ্য স্যাভিঞাক (de Savighnac) লিথো পদ্ধতিতে ছবি ছাপতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁদের কাজ কোনও অংশে বিলাতী শিল্পীদের কাজের চেয়ে খারাপ নয়। সে যা হোক, কলকাতার আদি লিথোগ্রাফিক প্রেসগুলোর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ-যোগ্য গভর্নমেণ্ট লিথোগ্রাফিক প্রেসের কথা। ১৮২৪ সনে চার্লস লাসিংটন-এর প্রসিদ্ধ বইটির জন্য (দি হিসট্রি, ডিজাইন, এন্ড প্রেজেণ্ট স্টেট অব রিলিজিয়ান...ইত্যাদি) ছবি ছাপা হয়েছিল সেখানে। ১৮২৫ সনে "এশিয়াটিক রিসার্চেস"-এর জন্য ছবি ছেপেছিলেন এশিয়াটিক লিথোগ্রাফিক প্রেস। কলকাতায় ছবি ছাপার কাজে ওঁদের বেশ নামডাক ছিল। তাছাড়া ধর্মতলায় ছিল টি. বি. টাসিন কোং, লিণ্ডসে স্ট্রীটে কমার্শিয়াল লিথোগ্রাফিক প্রেস, বলিন্স লিথো, ওরিয়েণ্টাল লিথো-গ্রাফিক কোং, হারমনিক লিথো, এম. এন. নানহাটস—ইত্যাদি হরেক মুদ্রণ সংস্থা। সুতরাং ১৮২৯ সনে স্থাপিত শুড়া লিথোগ্রাফিক প্রেস কলকাতার প্রথম লিথোগ্রাফিক প্রেস নয়। ছবি ছাপাবার একমাত্র প্রেসও নয়।

লিথো হোক, আর নাই হোক, বাংলা বইয়ে ছবি যোগ করার আগ্রহ দেখা গেছে সেকালের অনেক প্রকাশকের মধ্যেই। আমরা কিছু কিছু সচিত্র বইয়ের কথা উল্লেখ করেছি। তাছাড়াও মাঝে মাঝে মেলে সচিত্র বইয়ের খবর। ১৮২১ সনের ২২ সেপ্টেম্বর "মহাভাগবতোক্ত শিবনারদ সম্বাদযুক্ত ভগবতীগীতা নামক গ্রন্থের" রামরত্ন ন্যায়পঞ্চানন কৃত অনুবাদের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে—"তাহাতে বৃষযুক্ত বৃষধ্বজ নারদগোস্বামীকে যোগ কহিতেছেন এই ছবি। এবং মেনকার ক্রোড়দেশেবস্থিতা ভগবতী রাজা হিমালয়কে যোগ কহিতেছেন এই ছবিও আছে।" ১৮২৯ সনের শুড়া লিথোগ্রাফিক প্রেসের যে বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতে আরও বলা হয়েছে—"সর্বজন শিক্ষার ইংগরেজী উত্তম চিত্রাভিজ্ঞ সকলের মত গোড়ীয় ভাষায় সংকলন করিয়া ও চিত্র আদর্শ নিমিত্ত মনুষ্য ও পশ্বাদির ছবি ১৫ খান বিশেষ করিয়া এক গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে ঐ গ্রন্থ শুড়া পাষাণযন্ত্রে মুদ্রিত হইবেক তাহার মূল্য ৪ চারি টাকা স্থির করিয়াছেন।" শুধু তাই নয়, ওঁরা জানাচ্ছেন—"এদেশে অক্ষর লিখিবার তাহার কোন গ্রন্থ নাই এজন্য শুড়া পাষাণযন্ত্রাধ্যক্ষ অতি সুন্দর বড় অক্ষরে স্বর ও ব্যঞ্জন এবং যুক্তাক্ষর ও বর্ণসকলের উচ্চারণের স্থান বিশেষ করিয়া অক্ষর লেখা শিক্ষাকরণোপযোগী এক গ্রন্থ পাষাণ যন্ত্রে মুদ্রিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন।..." বিজ্ঞাপনের ভাষা দেখে মনে হয় এটাই বুঝি বাংলায় প্রথম আদর্শলিপির বই। কিন্তু আমাদের মনে হয় তার বেশ কিছুকাল আগে ১৮১৮—১৯ সনেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের খোশনবীশ কালীকুমার রায়ের হাতের লেখা ব্লক করে স্কুল বুক সোসাইটি বের করেছিলেন আদর্শ হস্তলিপির বই। সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক বিবরণে বলা হয়েছে—এজন্য দুখানা কপারপ্লেট খোদাই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, এই কালীকুমার রায়ের হাতের লেখা অনুসরণ করেই অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে তৈরি হয়েছিল উন্নত বাংলা হরফ। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কালীকুমার বেতন পেতেন মাসে ৪০ টাকা। তিনি মারা যান ১৮২২ সনে।

ছবি ছাপার খবর এখানেই শেষ নয়। ১৮৩৪ সনের ১ নভেম্বর "শোভাবাজারস্থ রোমানেজিং অর্থাৎ রোমান অক্ষরে মুদ্রাঙ্কনার্থ অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে যে ক্ষুদ্র আশ্চর্য এক গ্রন্থ" প্রকাশিত হয় তাতেও নাকি ছবি

ছিল। খবরে বলা হয়েছে—"এই গ্রন্থের মধ্যে অনেক ছবি প্রকাশ পাইয়াছে এবং শোভাবাজারের রাজবাটীর এক প্রতিবিম্ব প্রকাশিত আছে কিন্তু কোন্ ব্যক্তি কর্তৃক তাহা খোদিত বা ছবি হইয়াছে তাহা ব্যক্ত নাই শ্রীযুত সর চার্লস ডইলি সাহেবও ঐ ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে কতিপয় ছবি প্রকাশার্থ প্রদান করিয়াছেন।..." তার চার বছর পরে কলসওয়ার্দি গ্রাণ্টের আলেখ্যমালা। ১৮৩৯ সনের মার্চে জানানো হচ্ছে "পূর্বদেশীয় লোকের মুখচ্ছবি লিখিত চতুর্থ সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযুত গ্রাণ্ট সাহেব কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে।..."

• এসব খবরাখবর থেকে বোঝা যায় জনসাধারণের আগ্রহ নানা খাতে প্রবাহিত হচ্ছে, ছাপার কাজেও আসছে বৈচিত্র্য। অতঃপর বই ছাপা আর ছাপাখানার একমাত্র কাজ নয়। ছবি, মানচিত্র, নকশা—ইত্যাদি ছাপাও উদ্যোগী মুদ্রাকরের দায়িত্ব। ফলে হরফ-নির্মাতা আর বই-লেখকের মতোই ছাপাখানাকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে অন্য পেশাদারীর দল। কেউ তাঁদের চিত্রশিল্পী, কেউ ব্লক নির্মাতা। কেউ আবার একই সঙ্গে চিত্রকর এবং খোদাইশিল্পী দুই-ই।

এই শিল্পীদল গড়ে তোলার কাজে পরবর্তীকালে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে কলকাতার "শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভা"। ১৮৫৪ সনে তাঁরা স্থির করেন শহরে একটি শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। ঘোষণায় বলা হয়—"উক্ত বিদ্যালয়ে চিত্রবিদ্যা, কাষ্ঠ, ধাতু, প্রস্তরাদির তক্ষণবিদ্যা ও মৃৎপাত্র ও পুত্তলিকাদির গঠনোপযোগি বিদ্যার উপদেশ প্রদত্ত হইবে।" এই শিল্প-বিদ্যালয়ই সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ের পূর্বসূরী। তৎকালে তার ইংরাজী নাম ছিল—"স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট"। সেখানে কাঠখোদাই ছিল অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়। ১৮৫৫ সনে অন্তত তিরিশজন শিক্ষার্থী সেখানে কাঠখোদাই শিখেছিলেন। শিক্ষক ছিলেন —টি. এফ. ফাউলার নামে একজন সাহেব। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বইয়ের 'অর্ডার' সংগ্রহ করতেন, ছাত্ররা কাজ করে স্কুল চালাবার কিছু কিছু খরচ জোগাতেন। কমিশন হিসাবে তাঁরাও কিছু পেতেন। ১৮৫৮ সনে এ-কাজে পারদর্শিতা দেখিয়ে প্রথম পুরস্কার পান—কালিদাস পাল নামে একজন ছাত্র। দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন—নিমাইচরণ শেঠ। শিল্প-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাজের নমুনা ছড়িয়ে আছে সমসাময়িক কালে

প্রকাশিত নানা বইয়ে। যোগেশচন্দ্র বাগল বিশেষ করে দুটি বইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি ডি. এল. রিচার্ডসনের **অন ফ্লাওয়ারস অ্যান্ড ফ্লাওয়ার গার্ডেনস**, অন্যটি শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তার নির্দেশে প্রকাশিত **ঈশপস্ ফেবলস।** ক' বছর পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের **অ্যান্টিকুইটিস অব ওড়িশা** (১ম খন্ড) বইটিকেও চিত্রিত করেছিলেন বিদ্যালয়ের ছাত্ররাই। তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন সুখ্যাত শিল্পী অন্নদাপ্রসাদ বাগচী।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন—শিল্প বিদ্যালয়ের কিছু ভূতপূর্ব ছাত্র কাঠ-খোদাইকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ গোপাল চন্দ্র কর্মকার। তাঁর কাজ ইউরোপীয়দের শিল্পীদের সঙ্গে তুলনীয়।

শিল্পবিদ্যালয় সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয় ১৮৬৪ সনের জানুয়ারি মাসে।

দ্রষ্টব্য : **সংবাদপত্রে সেকালের কথা,** (২য় খন্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; *Publications in the Bengali Language in 1857,* —Rev. J. Long, 1859 ; *Art Manufatures of India*—Rev. T. N. Mukherji, 1888 ; *Early Indian Imprints*—Katharine Smith Diehl, 1964 ; *History of the Government College of Art and Craft*—Jogesh Chandra Bagal, *Centenary, Government College of Art & Craft*, Calcutta, 1964 ; **সে-যুগের ধাতু-খোদাই ও কাঠখোদাই শিল্প**—যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৬১।

৪৯। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বাংলা মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রথম বাঙালী মুদ্রাকর, প্রথম বাঙালী প্রকাশক, প্রথম বাঙালী সংবাদপত্র পরিচালক এবং প্রথম বাঙালী বই বিক্রেতা। সুকুমার সেন মশাইয়ের ভাষায়—"বাঙালী পুস্তক প্রকাশকদিগের ব্রহ্মা হইতেছেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। বটতলার হাটেরও তিনিই প্রথম হাটুয়া।" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন দেশীয় লোকেদের মধ্যে প্রথম ছাপাখানার প্রতিষ্ঠাতা বাবুরাম। সংস্কৃত এবং হিন্দী বই ছাপবার জন্য তিনি খিদিরপুরে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন ১৮০৬-৭ সনে। তাঁর কথা আগে বলা হয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ লিখছেন—"১৮১৪-১৫ সনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মুন্সী লাল্লুলাল কবি নামে একজন

গুজরাটী ব্রাহ্মণ বাবুরামের যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে।” বাবুরাম এবং লাল্লুলালের ছাপাখানা সম্পর্কে কিছু খবর আছে ক্যাথারিন ডিল-এর উল্লেখিত বইটিতে। এঁদের পরেই আবির্ভূত হলেন গঙ্গাকিশোর।

গঙ্গাকিশোর ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন ১৮১৮ সনে। সে ছাপাখানার নাম—বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস বা আপিস। **বাঙ্গাল গেজেটি** নামক খবরের কাগজ কিংবা ভারতচন্দ্রের **অন্নদামঙ্গল** ছাড়াও গঙ্গাকিশোর বেশ কিছু বইয়ের সম্পাদক এবং প্রকাশক। তিনি নিজেও কয়েকটি বই লিখেছেন। তার মধ্যে বাংলাভাষায় লেখা ইংরাজী ব্যাকরণ, দ্রব্যগুণ, চিকিৎসার্ণব উল্লেখযোগ্য।

ছাপাখানা নিয়ে বহরা গ্রামে চলে যাওয়ার পরও গঙ্গাকিশোর কিন্তু ছাপার কাজ চালিয়ে গেছেন। ১৮২৪ সনে তাঁর দ্রব্যগুণ প্রকাশিত হয়েছিল “কলিকাতার বাহিরে মোং বহেড়াতে।” তাঁর শ্রীভগবদ্গীতাও ছাপা হয়েছিল “মোকাম বহরা”য়। বহড়ার দু'রকম বানানই দেখা যায়।

সম্প্রতি শ্রীদাশরথি তা মশাই গঙ্গাকিশোর এবং হরচন্দ্রের ছাপাখানা সংক্রান্ত কিছু দলিল বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদকে দান করেছেন। তার মধ্যে বহড়ায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার সরকারী অনুমতিপত্রটিও রয়েছে। অনুমতি দিচ্ছেন চীফ সেক্রেটারি এম. এল. বেইলি। তারিখ ২ এপ্রিল, ১৮১৯ সন। তিনি বহড়াকে মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী গ্রাম বলে উল্লেখ করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যরা বলেছেন বহড়া শ্রীরামপুরের কাছে। কিন্তু এখন প্রমাণ মিলেছে বহড়া বর্ধমান জেলায়, ব্যান্ডেল-বারহাড়োয়া রেল লাইনের অগ্রদ্বীপ স্টেশনের অদূরে। সেখানে এখনও রয়েছে গঙ্গাকিশোরের ভিটে। স্থানীয় লোকেরা এখনও নাকি তাকে বলেন—‘ছাপাখানা ডাঙা’।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—ছাপাখানার সাধারণ কর্মী থেকে ক্রমে লেখক বা প্রকাশকের ভূমিকায় কিন্তু আরও কোনও কোনও বাঙালীকে দেখা গেছে। গঙ্গাকিশোর, আগেই বলা হয়েছে, জীবন শুরু করেছিলেন শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসে একজন কম্পোজিটার হিসাবে। স্বনামধন্য রামকমল সেন মশাইও কিন্তু প্রথম জীবনে ছিলেন ছাপাখানার একজন দীন কর্মী। হিন্দুস্থানী প্রেসে কাজ করেতেন তিনি। সেটা ১৮০৪ সনের

কথা। মাসিক বেতন ছিল তাঁর ৮ টাকা। ধাপে ধাপে সেখান থেকে কোথায় তিনি পোঁছেছিলেন তা আজ সকলের জানা। রামকমল সেনের বিশাল দুই খন্ড ইংরাজী-বাংলা অভিধান আমাদের প্রকাশনার ইতিহাসে এক বিরাট কীর্তি। সমান রোমাঞ্চকর তার মুদ্রণ কাহিনী। সে-প্রসঙ্গ পরে। কথাচ্ছলে এই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল আর একজন বিশিষ্ট বাঙালী লেখকের কথা যিনি ধাতব-হরফ নিয়ে খেলতে খেলতে একসময় হাতে তুলে নিয়েছিলেন কলম। ইনি রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯—১৮৯৪)। অনেকে জানেন না, রাজকৃষ্ণ রায় এক সময় ছিলেন ছাপাখানার সামান্য এক কর্মী মাত্র। সাহিত্যসাধক চরিতমালায় রাজকৃষ্ণ সম্পর্কে বলা হয়েছে—"উপার্জনের অভিলাষে রাজকৃষ্ণ সর্বপ্রথম কৃষ্ণগোপাল ভক্তের সিমুলিয়া মানিকতলা স্ট্রীটে অবস্থিত নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে (নিউ বেঙ্গল প্রেস) যোগদান করেন।" তারপর মেছুয়াবাজারে আলবার্ট প্রেসে। আলবার্ট প্রেস বন্ধ হয়ে গেলে ঋণ করে তিনি নিজেই ৩৭নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীট ঠনঠনিয়ায় একটা ছোট্ট ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। নাম তার—"বীণা যন্ত্র"। এই ছাপাখানাটি ১৮৯২ সনের শেষ পর্যন্ত চালু ছিল।

দ্রষ্টব্য : **গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য**—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ; **দৈনিক দামোদর**, সম্পাদক—দাশরথি তা, ১ম বার্ষিক সংকলন, ১৩৮১ ; **বটতলার বেসাতি**—সুকুমার সেন, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫৫ ; **প্রথম বাংলা সচিত্র পুস্তক**—অমূল্যচরণ বিদ্যা-ভূষণ, ভারতী ; জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ ; *Books in the Indian Languages*—Hemendra Kumar Sarkar, (*Early Indian Imprints*, K. S. Diehl, 1964) ; **রামকমল সেন**—প্যারীচাঁদ মিত্র, ১৯৬৪ ; **রাজকৃষ্ণ রায়**—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যসাধক চরিতমালা।

৫০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই তাঁর দুটি প্রবন্ধে বাঙালী শিল্পীদের কাজের কিছু নমুনা দেখিয়েছেন। শিল্পীদের নাম, অনেক-ক্ষেত্রে ধামও ছবিতে খোদাই করা আছে। কিছু নমুনা প্রকাশ করেছিলেন যোগেশচন্দ্র বাগল মশাই তাঁর বাংলা এবং ইংরাজী প্রবন্ধ দুটির সঙ্গেও। স্কুল-বুক সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক বিবরণে (১৮১৮—১৯) কাশীনাথ মিস্ত্রী নামে একজন খোদাই-শিল্পীকে প্রশংসা করা হয়েছে। পরের বছর (১৮২০) 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' কাগজ পঞ্চমুখ জোড়াসাঁকোর হরিহর

ব্যানার্জির কাজ দেখে। তবে এসব রচনায় উল্লেখিত বইগুলো ছাড়াও বাঙালী শিল্পীদের কাঠখোদাইয়ের অসংখ্য নমুনা ছড়িয়ে আছে পুরানো পঞ্জিকাগুলোতে। পঞ্জিকার জনপ্রিয়তার কথা সর্বজনবিদিত। লঙ সাহেব জানিয়েছেন ১৮৫৭ সনে বিক্রির জন্য পঞ্জিকা ছাপা হয়েছিল ১ লক্ষ ৩৫ হাজার। তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা প্রকৃত সংখ্যা আড়াই লক্ষের কম হবে না। দাম খুবই সস্তা, প্রতি ৮০ পৃষ্ঠা এক আনা। তিনি লিখছেন—পান তামাকের মতোই গৃহস্থঘরে পঞ্জিকা চাই-ই চাই। একশ পঁয়ত্রিশ বছরের পুরানো হাতে-লেখা পঞ্জিকাও তিনি দেখেছেন। তাঁর আমলে সে-পঞ্জিকা কিনতে পয়সা খরচ হয় মাত্র দু' আনা। হিন্দুর পঞ্জিকার জনপ্রিয়তা দেখে খ্রীষ্টানী পঞ্জিকাও ছাপা হয়। কিন্তু জনপ্রিয়তায় শ্রীরামপুর বা নবদ্বীপের পঞ্জিকার সংগে তা পারবে কেন? ওই সব পঞ্জিকার আর এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল কাঠখোদাই ছবিগুলো। মনোহর-পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের আঁকা পঞ্জিকার ছবির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেসব ছবি সত্যই উপভোগ্য। বস্তুত পুরানো পঞ্জিকার ছবিকে বাদ দিলে সচিত্র বাংলা বইয়ের যে-কোনও আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য। অনেক ক্ষেত্রেই পঞ্জিকা আর বইয়ের ছবি আঁকিয়ে কিন্তু একই শিল্পীদল। রামধন স্বর্ণকারের নাম কিন্তু শুধু বাংলা বইয়েই নয়, খুঁজে পাওয়া যাবে পাদ্রী লঙ সাহেব সম্পাদিত **সত্যার্ণব** (১৮৫০) কাগজেও। ঠিক তেমনই হোগলকুড়িয়া নিবাসী পঞ্চানন কর্মকারেরও দেখা মিলবে যত্রতত্র। প্রসংগত বলে রাখা ভাল, এই পঞ্চানন উইলকিন্স-এর সাগরেদ পঞ্চানন নন।

দ্রষ্টব্য : **খোদাই চিত্রে বাঙালী (প্রাচীন কাঠখোদাই)**—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৬ ভাগ, ২য় সংখ্যা, ১৩৪৬ ; **বাংলার প্রাচীন ধাতু খোদাই চিত্র**—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৫৩ ; **সংবাদপত্রে সেকালের কথা,** ১ম খণ্ড, সম্পাদকীয় আলোচনা ; **প্রথম বাংলা সচিত্র পুস্তক**—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ ; **সে যুগের ধাতু খোদাই ও কাঠ খোদাই শিল্প**—যোগেশ-চন্দ্র বাগল, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৬১ ; **বংগীয় গ্রন্থচিত্রণ**—কমলকুমার মজুমদার, এক্ষণ, ৪—৫ সংখ্যা, ১০ম বর্ষ ১৩৭৯ ; **বাংলা শিশু গ্রন্থ-সজ্জার একশ' বছর**—নিখিল সরকার, দেশ, ২০ কার্তিক, ১৩৬১ ;

On the Native Press,—Friend of India, Sept, 1820 ; *Book Illustrations in Bengal in the Early 19th Century*—J. C. Bagal, *All India Printer's Conference Exhibition,* 1954.

৫১। W. G. Archer লিখেছেন—"The last phase of Kalighat Painting occurs in the years 1885—1930. Bold simplifications continued to be the rule and in a desperate attempt to cheapen production, line drawings and tinted woodcuts were also produced." এই সব কাঠখোদাই ছবি কিন্তু পাওয়া যেত কালীঘাটে নয়, চিৎপুরে। অধিকাংশ ছবিতেই শিল্পীদের নাম-ঠিকানা খোদাই করা রয়েছে। বলতে গেলে সবাই উত্তর কলকাতার বটতলা এলাকার বাসিন্দা। কালীঘাটের মতোই এই সব শিল্পীদের কাজে, বিশেষ করে অলংকরণে বিদেশী প্রভাব অনস্বীকার্য, তবে আর্চার পাশাপাশি নমুনা সাজিয়ে দেখিয়েছেন তাঁদের শিল্পকর্মের প্রভাব পড়েছিল এমন কি দূর প্যারিসে শিল্পীদের কাজে।

দ্রষ্টব্য : *Kalighat Paintings*—W. G. Archer, 1971.

৫২। **পশ্বাবলী** সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা-স্কুল-বুক সোসাইটি কর্তৃক "পশ্বাবলী" নামে একখানা বাংলা মাসিক-পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার প্রত্যেক সংখ্যায় একটি করিয়া জন্তুর বিবরণ এবং প্রথম পৃষ্ঠায় সেই জন্তুর কাঠ-খোদাই চিত্র থাকিত। "পশ্বাবলী" পত্রের প্রথম পর্যায় পাদরি লস্‌ন কর্তৃক সংগৃহীত ও ডবলিউ. এইচ. পীয়ার্স কর্তৃক বাংলায় অনূদিত হয়। কাঠ-খোদাই চিত্রগুলি লসনের ; তিনি কাঠ-খোদাই কার্যে সুপটু ছিলেন।"

সম্প্রতি একজন গবেষক, সবিতা চট্টোপাধ্যায় তাঁর **বাঙালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক** বইটিতে জন লসন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে জানিয়েছেন —"তিনি স্বহস্তে বাংলা প্রভৃতি অক্ষর তৈরি করিতেন, সচিত্র গ্রন্থের চিত্রাবলীর জন্য ধাতু নির্মিত ব্লক নির্মাণ করিতেন। বাংলা মুদ্রণে ধাতু নির্মিত ব্লকের ব্যবহারে লসেনই পথপ্রদর্শক।" এই উক্তি যে-সূত্র থেকেই সংগৃহীত হোক না কেন, এটা সত্য নয়,—লসনই ধাতুনির্মিত ব্লকের

প্রথম নির্মাতা নন। প্রথমত **পশ্বাবলী** প্রথম সচিত্র বই নয়। দ্বিতীয়ত, গঙ্গাকিশোরের "অন্নদামঙ্গল"-এর ছবি সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছেন—"ইহাতে কাঠ ও ধাতু খোদাই ছয়খানি চিত্র আছে।" (প্রবাসী) অন্যত্র লিখেছেন—"এই পুস্তকে ছয়খানি চিত্র আছে ; প্রায় সবগুলিই লাইন এনগ্রেভিং।" (সাহিত্যসাধক চরিতমালা) "পশ্বাবলী"র ছবি কাঠ-খোদাই নয়,—বিশেষজ্ঞরা কিন্তু একথাও মানতে নারাজ। ধরা গেল, এগুলো ধাতু-খোদাই। সেক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে "পশ্বাবলী"র আগে ধাতু-খোদাইয়ের ব্যবহারের অন্য দৃষ্টান্তও আছে। তা-ছাড়া কলকাতায় জন লসন-এর পদার্পণের অনেক আগে থেকেই কিন্তু একাধিক শিল্পী নানা "আধুনিক পদ্ধতিতে" ছবি ছাপাচ্ছিলেন। ১৭৮৪ সনের জুলাইয়ে লালবাজারে বসে জনৈক মিঃ ব্রিট্রিজ ক্যালকাটা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানাচ্ছিলেন—তিনি জোফানির আঁকা ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ছবির প্রিন্ট বিক্রি করছেন। প্রতিটির দাম দুই গোল্ড মোহর। এখানেই শেষ নয়। সেপ্টেম্বরে তিনি কলকাতাবাসীকে আবার জানাচ্ছেন —আপনারা ভাবতে পারেন মিঃ ব্রিট্রিজ বুঝি ওই এক কাজেই ব্যস্ত। মোটেই তা নয়। তিনি ছবি মুদ্রণের সব ধরনের কাজই করেন।— ভিজিটিং টিকেট, কমপ্লিমেণ্ট কার্ড, প্লেট, কপার প্লেট সবই ছাপাতে সক্ষম তিনি। বেইলির মানচিত্র বিজ্ঞপিত হয় ১৭৯২ সনের ২৯ নভেম্বর, আপজন তাঁর শিয়ালদহের বাড়িতে বসে উইলিয়াম জোন্স-এর ছবি এনগ্রেভ করেছেন ১৭৭৫ সনের জানুয়ারীতে। সে বছরই কলকাতায় ছাপা হয়েছে দেখি বেইলির দ্বাদশ-চিত্র। কোথায় তখন জন লসন?

সন্দেহ নেই জন লসন (১৭৮৭—১৮২৫) মুদ্রণশিল্পে সুশিক্ষিত। চিত্রকর হিসাবেও তিনি অতিশয় দক্ষ। তিনি এদেশে পৌঁছান ১৮১২ সনে। শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব বাংলা এবং চীনা হরফের উন্নতি। অপেক্ষাকৃত বড় হরফকে ছোট করার কৌশলটি নাকি তিনিই শিখিয়েছিলেন সেখানকার হরফ-শিল্পীদের। লসন-এর নানা জীবনীতে তাঁর কৃতিত্ব সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি :

"The great work which John Lawson accomplished, and for which he is certainly entitled to the thanks of the

religious public, was the reduction of the types used in the Eastern Languages, particularly the Bengali and Chinese. ."

এই উক্তি লসন-এর মৃত্যুর পর (১৮২৫) সহকর্মী ডঃ ইয়েটস-এর। লসন নিজে ১৮১৪ সনে এক চিঠিতে লিখেছেন—". . . .I am now employed in cutting punches for Malay Bible. . . .I have been principally engaged as an artist ever since my arrival in India. . . .At present I do nothing of the Chinese. I taught two natives the method of reducing the character, they are now employed in the department. I teach drawing in the school and some of our young ladies could furnish specimens of improvement which could not disgrace an English Boarding School. . . .".

"ব্যাপটিস্ট ম্যাগাজিন"-এ প্রকাশিত এই চিঠিটি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শ্রীরামপুরের কেরী-লাইব্রেরির শ্রীসুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীরামপুরের কেরী-গ্রন্থাগারে রক্ষিত অপ্রকাশিত হাতে লেখা মিশনারী জীবনীতে লসন সম্পর্কে লিখিত আছে :

> "13. 8. 1812 : Removed to Serampore and put himself to work required of him. The great work he accomplished was reduction of the types of Eastern Languages, particularly the Bengali and Chinese.
>
> 1814 : Still engaged in reducing the types, a task which expected to take several years. . . .Great and important improvement had been effected by him in Chinese typography. . . . He also introduced movable metallic types.
>
> 1815 : Having taught the natives to cut punches, he did not deem it to do this mechanical work any longer."

এই জীবনীটির লেখক ই. এস. ওয়েঙ্গার। তিনি লসন-এর বংশধর।

তারপর ১৮১৬ সনে জন লসন চলে আসেন কলকাতায়। এখানে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে অন্যতম কর্মী তিনি। **পশ্বাবলী**-র ছবি ছাড়াও তিনি গাছপালা, লতাপাতার কিছু চমৎকার ছবি এঁকেছিলেন। ডাব্লিউ. এইচ. কেরী তাঁর মিশনারীদের জীবনীগ্রন্থে জন লসন-এর আঁকা এই ছবিগুলি সম্পর্কে বলেছেন—উদ্ভিদবিদ্যা যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের কাছে এই ছবিগুলো বিবেচিত হবে অমূল্য। লসন-এর মৃত্যু ১৮২৫ সনের অক্টোবরে। তাঁর বয়স তখন মোটে আটত্রিশ।

এই আলোচনায় যা জানা গেল তা হচ্ছে এই : লসন হরফ-শিল্পী এবং চিত্রশিল্পী। শ্রীরামপুরে তিনি মেয়েদের একটি স্কুলে ছবি আঁকা শেখাতেন। ডবলিউ. এইচ. কেরী জানিয়েছেন তাঁর ছাত্রী ছিলেন পঞ্চাশ জন। অথচ সবিতা চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—"শ্রীরামপুরে প্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া তিনি এই বিষয় শিক্ষার একটি স্কুলও খুলিয়াছিলেন। ইহাই বঙ্গদেশে মুদ্রণবিষয়ক প্রথম বিদ্যালয়"। দু' একজন দেশীয় হরফ-শিল্পীকে নতুন কোনও করণ কৌশল শেখানো কিন্তু প্রচলিত অর্থে বিদ্যালয় নয়। তাহলে এদেশে প্রথম মুদ্রণবিষয়ক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বোধহয় চার্লস উইলকিন্‌স।

জন লসন সম্পর্কে যাঁরা বিস্তারিত জানতে আগ্রহী তাঁদের পক্ষে অবশ্যপাঠ্য : *John Lawson—Missionary Biography.*, Vol—I, (MSS), E. S. Wenger, Carey Library, Serampore ; *Oriental Christian Biography*, (Vol-2)—W. H. Carey, 1850 ; *Early Indian Imprints*—K. S. Diehl, 1964 ; *Baptist Magazine*, April, 1814. এছাড়া দ্রষ্টব্য : *Selections from Calcutta Gazettes*, Ed.—W. S. Seton-Karr, Vol—1 & 2., 1864. **বাংলা সাময়িকপত্র**, (১ম খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৫৮ ; **বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক**—সবিতা চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭২।

৫৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায়, ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে (কার্তিক ১২৫৮) বিলাতী 'পেনী ম্যাগাজিনে'র আদর্শে "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলায় প্রকৃতপক্ষে ইহাই প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা।" পত্রিকার বিজ্ঞাপনেও

বলা হয়েছিল—"উক্তপত্র অতি কোমল ভাষায় লিখিত হইবেক, এবং তত্রত্য প্রস্তাবিত বস্তু সকলের বিশেষ পরিজ্ঞানার্থে তাহাতে নানাবিধ ছবি থাকিবে।" ও'রা কথা রেখেছিলেন। যোগেশ বাগল মশাই লিখেছেন (প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৬১)—"ইহাতে যেসব চিত্র মুদ্রিত হইত তাহার প্লেট আসিত লণ্ডন হইতে। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের প্রধান উদ্যোগী বেথুন সাহেব প্রথম বৎসরেই বিলাত হইতে এরূপ প্রায় আশীখানা ব্লক আনাইয়াছিলেন।" ব্লক, না চিত্র খোদাই করার জন্য প্রয়োজনীয় ধাতব প্লেট? মনে হয়, আমদানি করা হয়েছিল দ্বিতীয় বস্তুটিই। যাই হোক না কেন, সচিত্র এই পত্রিকাটি সুমুদ্রিতও বটে। হরফ বিন্যাস, ছবি সব মিলিয়ে সর্বত্র সুরুচি এবং মুদ্রণ-নৈপুণ্যের পরিচয়। মুদ্রাকর ছিলেন—কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস। উনিশ শতকের অর্ধেক তখন পার হয়ে গেছে, তবু সচিত্র কাগজ বা বই ছাপা যে তখনও রীতিমত কষ্টসাধ্য "বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে"র একটি বিজ্ঞপ্তি থেকে তা বোঝা যায়। এই বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয়েছিল প্রথম খণ্ড, ১১ নম্বর সংখ্যায় (৩০ আশ্বিন, শকাব্দ ১৭৭৪)। তাতে বলা হয়েছে—যে প্রস্তরে বিবিধার্থ সঙ্গ্রহের লক্ষজ্ঞাপক চিত্র মুদ্রিত হইত দৈবাৎ তাহা বিনষ্ট হওয়াতে তাহা পুনঃ প্রস্তর করণান্তর এই সংখ্যা তিন পক্ষকাল বিলম্বে প্রকাশ করণাপেক্ষায় ইদানীং বিনা চিত্রে প্রকাশ করা শ্রেয় বোধে তাহাই করা গেল।" অর্থাৎ, মলাটের ব্লকটি নষ্ট হয়ে গেছে এবং নতুন ব্লক তৈরি করাতে সময় লাগবে দেড় মাস! সুতরাং, বিনা মলাটেই ও'রা কাগজ বের করে দিলেন।

দ্রষ্টব্য : **বাংলা সাময়িক পত্র,** (১ম খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; **সে যুগের ধাতুখোদাই ও কাঠখোদাই শিল্প**—যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৬১ ; এবং **বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ,**—১ম খণ্ড, ১১ সংখ্যা।

৫৪। পুরানো বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে ভাল ছাপার নানা নমুনা চোখে পড়েছে আমাদের। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সচিত্র বইয়ের সংখ্যাও স্বভাবতই অনেক বেশি। তার মুখ্য অংশই ছেপেছেন বটতলার প্রকাশকরা। এবং তাঁদের ছাপা বইয়ে অধিকাংশ ছবিই কাঠখোদাই। চিৎপুর এলাকায় তখন সবচেয়ে নামকরা প্রকাশক নৃত্যলাল শীল। সুকুমার সেন সন্ধান করেছেন এন. এল. শীল এণ্ড কোম্পানির যাত্রা শুরু নাকি উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের শেষ দিকে। ১৮৬৮ সনে

ছাপা নিধুবাবুর "গীতরত্নমালা"র মলাটে তিনি ও'দের আটান্নটি বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখেছেন। সচিত্র বইও ছিল নিশ্চয়।

চিৎপুরের বাইরে সমসাময়িক কালে বাংলা বইয়ের আর তিন প্রখ্যাত মুদ্রাকর পি. এস. ডি' রোজারিও এণ্ড কোং, লালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং, এবং আই. সি. বোস কোম্পানির স্ট্যানহোপ প্রেস। প্রথম কোম্পানির ঠিকানা ছিল ৪নং ট্যাঙ্ক স্কোয়ার, দ্বিতীয়ের—১৩নং বাহির মির্জাপুর (পরে ১৬নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্ট্রীট), এবং তৃতীয়টির ঠিকানা—বৌবাজার স্ট্রীট। "বিবিধার্থ সংগ্রহে"র প্রথম সংখ্যায় রোজারিও কোম্পানির এক বিরাট বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল। এই ছাপাখানাটির প্রতিষ্ঠা ১৮৪০ সনে। "আলালের ঘরের দুলাল" ছাড়াও এ'রা "শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর"-এর "মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়" বইটির প্রকাশক। দ্বিতীয় বইটির ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন—"বাসনা ছিল যে দুই তিনটি গল্প তসবিরের সহিত প্রকাশ হইবে কিন্তু তাহা সুবিধাপূর্বক না হওয়াতে মূল্য অল্প করা গেল।" লালচাঁদ বিশ্বাস কোম্পানির বিশিষ্ট প্রকাশন নাকি রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের "সত্যচন্দ্রোদয়"। আই. সি. বোস বা "শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু এণ্ড কোং"-এর স্ট্যানহোপ প্রেস অনেক প্রসিদ্ধ বইয়ের মুদ্রাকর। এই প্রেসটির প্রতিষ্ঠাকালও ১৮৪০ সন।

সুকুমার সেন মশাই লিখছেন—"I. C. Bose's was the best production in Bengali printing and publication. The first facsimile specimen of a poem in a poets autograph in any native Indian language appeared in the first and second editions of Michael M. S. Dutt's book of sonnets." এছাড়াও আই. সি. বোস কোম্পানির বিখ্যাত একটি বই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদ্যোগে প্রকাশিত সচিত্র "বিদ্যাসুন্দর নাটক"। বইটির মুদ্রণ পারিপাট্য সত্যই দেখবার মতো। ছবিগুলো কার আঁকা উল্লেখ নেই। তবে চিত্রকর এবং ব্লক-নির্মাতা দু'জনের দক্ষতাই প্রশ্নাতীত। এই প্রতিষ্ঠানের ছাপা প্যারীচাঁদ মিত্রের "আধ্যাত্মিকা" বইটিতেও ছবি রয়েছে। সেগুলো লিথোগ্রাফ। তৈরি করেছিলেন—ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও। আগেই বলা হয়েছে সেটি চালাতেন আর্ট স্কুলের ভূতপূর্ব ছাত্ররা।

এই সংক্ষিপ্ত নমুনা সমীক্ষা থেকেই বোঝা যায় ছবি ছাপা তখন

কঠিন কাজ হলেও বাঙালী প্রকাশকরা নতুন নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পিছ্পা হচ্ছেন না।

দ্রষ্টব্য : *Early Printers and Publishers in Calcutta*—Sukumar Sen, *Bengal Past and Present,* January—June, 1968, Serial No 163.

৫৫। উপেন্দ্রকিশোর বাঙালীর গর্ব। তাঁকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার কোনও প্রয়োজন হয় না। তিনি লেখক, শিল্পী, সংগীতজ্ঞ এবং প্রসিদ্ধ মুদ্রাকর। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইউ. রায় এন্ড সন্সের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লীলা মজুমদার লিখেছেন—"১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ছাপার কাজ ও ছবি এনগ্রেভ করা সম্বন্ধে তাঁর এতখানি শেখা ও জানা হয়ে গিয়েছিল, এতখানি দক্ষতা ও নিজের উপরে একটা বিশ্বাস এসেছিল যে সাহস করে নিজের পয়সায় বিলেত থেকে কিছু যন্ত্রপাতি আনিয়ে নিজের ছাপাখানার কাজ শুরু করে দিলেন। এই ভাবে সেকালের বিখ্যাত ইউ. রায় এন্ড সন্সের গোড়াপত্তন হল।" মুদ্রাকর হিসাবে উপেন্দ্রকিশোরের বৈশিষ্ট্যঃ তিনি গতানুগতিকায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিজ্ঞানীর, কী করে ছাপার, বিশেষ করে ছবি ছাপার কাজের মান আরও উন্নত করা যায় তাই নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত ছিল না। প্রথম যুগের "সন্দেশ"-এর পাতায় এখনও রয়েছে চিত্রকর এবং মুদ্রাকর উপেন্দ্রকিশোরের নৈপুণ্যের স্বাক্ষর। লীলা মজুমদার লিখেছেন তাঁর **ছেলেদের রামায়ণ**-এর ছবির ব্লক করানো হয়েছিল প্রথমে অন্যদের দিয়ে। তাঁরা সব ছবি নষ্ট করে ফেলেন। তাই দেখে উপেন্দ্রকিশোরের সে কী খেদ। এর পর নিজেই তিনি শিল্পী এবং ব্লক-কারিগর।

ইউ. রায় কোম্পানির প্রতিষ্ঠা—১৮৮৫ সনে। পরে এই প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় ইউ. রায় এন্ড সন্স। উপেন্দ্রকিশোরের পরিবারের সংগে সংগে ছাপাখানাও এক এক সময় এক এক ঠিকানায়। প্রথমে ১৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে, তারপর ৭ শিবনারায়ণ দাস লেনে, সেখান থেকে ২২ সুকিয়া স্ট্রীট হয়ে অবশেষে ১০০ গড়পার রোডে স্থিতি। এই প্রসিদ্ধ সংস্থাটির অবলুপ্তি ১৯২৭ সনে। অবশ্য আঁকা এবং লেখার ঐতিহ্য ওই পরিবারে এখনও বহমান। আরও বেগবান।

ব্লক-এর ব্যাপারে উপেন্দ্রকিশোরের সবচেয়ে স্মরণীয় কীর্তি বাংলা বইয়ে হাফ-টোন ব্লকের ব্যবহার। ব্লক নির্মাণ পদ্ধতির সংস্কার। মারি সিটন তাঁর লেখা সত্যজিৎ রায়ের জীবনীতে মুদ্রাকর উপেন্দ্রকিশোর সম্পর্কে লিখছেন—

"Being a perfectionist, Upendrakishore found existing processes too primitive for him. He sorted out rival theories and reached his own conclutions. This subsequently had international repercussions. He commenced experiments on standardization of printing methods. By 1904-5, Penrose Annual, for which Ray wrote technical articles, was claiming that "Mr. Ray is evidently possessed of a mathematical quality of mind and he has reasoned out for himself the problem of half-tone work in a remarkable successful manner."

শুধু তাই নয়। মারি সিটন-এর ভাষায়—"Grandfather Ray had become Calcutta's outstanding printer by working out machines of his own devising—a screen-adjusting machine and a sixty-degree screen and a diaphragm system. Initially this was to aid a perfected reproduction of his own paintings and illustrations for the books he wrote himself."

উপেন্দ্রকিশোরের আঁকা ছবি হাফটোন-এ ছাপা হয় তাঁর **সেকালের কথা** বইটিতে। প্রথম প্রকাশ—১৯০৩। আমরা যে বইটি দেখেছি সেটি ছাপা হয়েছিল "কলিকাতা ২৫নং রায়বাগান স্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে, সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা"। ভূমিকায় উপেন্দ্রকিশোর লিখছেন—"এই পুস্তকে ১৭ খানি বড় বড় ছবি আছে। এই সকল ছবি এই পুস্তকের জন্যই বিশেষভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল,...ইহাদের একটিও ইংরাজি পুস্তকের ছবির নকল নহে"।

অনায়াসে তিনি বলতে পারতেন—ব্লক তৈরিতেও আমি ইউরোপীয়-দের হুবহু নকল করিনি। বাঙালী মুদ্রাকর সেদিন সত্যই অবিশ্বাস্য উদ্ভাবক।

দ্রষ্টব্য : **উপেন্দ্রকিশোর**—লীলা মজুমদার, ১৮৮৫ শকাব্দ ; *Portrait of a Director—Satyajit Ray*—Marie Seton, 1971. এছাড়া উপেন্দ্রকিশোর সম্পর্কে দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা লিখেছেন কেদার চট্টোপাধ্যায়। সেগুলো প্রকাশিত হয়েছিল **প্রবাসী**, মাঘ, ১৩২২ এবং **বিশ্বভারতী পত্রিকা**, কার্তিক-পৌষ, ১৩৭০ সনে।

৫৬। বাংলা হরফ তৈরির সমস্যা নিয়ে সংক্ষিপ্ত, অথচ মূল্যবান আলোচনা করেছেন নরমান এলিস। দীর্ঘকাল তিনি কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

দ্রষ্টব্য : *Indian Typography*—Norman A. Ellis, *The Carey Exhibition of Early Printing and fine Printing*, National Library, Calcutta, 1955.

৫৭। বাংলা বর্ণমালার মতোই কৌতূহলোদ্দীপক বাংলা ছাপা হরফের বিবর্তন। ছাপাখানার প্রথম যুগে হরফ-শিল্পীর সামনে নমুনা যদি হাতে লেখা পুঁথি, তবে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আদর্শলিপি আজ মুদ্রিত হরফ। আগে মুদ্রাকরের লক্ষ্য ছিল ভাল হাতের লেখার মতো ছাপা ; ভাল হাতের লেখাকে আমরা আজ বলি যেন ছাপার হরফ। এই বিবর্তন, বলা নিষ্প্রয়োজন, একদিনে ঘটেনি। গত দু'শ বছর ধরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে আমাদের ছাপার হরফ নিয়ে।

সে-ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে-সত্যটিকে মেনে নিতে হবে তা হল এই যে, যদিও আধুনিক হরফ তৈরির বিদ্যা পেয়েছি আমরা ইউরোপের কাছ থেকে তবু হরফ তৈরির প্রতি পর্যায়ে স্থানীয় শিল্পী এবং কারিগরদের বিশেষ ভূমিকা।

পঞ্চানন-মনোহরের কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ১৮০৪ সনের ২০ সেপ্টেম্বর লর্ড ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সভায় কলেজের প্রকাশন বিভাগের অগ্রগতির পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন—"Great improvements have been introduced in the art of printing the oriental characters, by Native artist ; and several of the learned Natives are employed in publishing various works of Oriental Literature, under the aid derived from the improved art of printing."

কী সেই উন্নতি? সে বছর নতুন একপ্রস্থ দেবনাগরী হরফ ছাড়াও অন্যান্য ভাষার হরফ নিয়ে নানা কাজ হলেও বাংলা হরফে কী পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল সেটা খুব স্পষ্ট নয়। বস্তুত এ পর্যন্ত কত ধরনের বাংলা হরফ তৈরি এবং ব্যবহৃত হয়েছে সেটা যোগ্য অনুসন্ধানীর পক্ষে রীতিমত এক অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারে। শুধু হরফ কেন, ছাপার কাজে ব্যবহৃত অলঙ্কার ইত্যাদিও পর্যালোচনার বিষয়। অলঙ্করণে সেকালে অতি-উৎসাহী এক মুদ্রাকর—বাবুরাম। ১৮১১ সনে ছাপা **সিদ্ধান্ত কৌমুদী**তে তার নমুনা আছে। রুল-এর ব্যবহার এবং অপ-ব্যবহারের কিছু নমুনা শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসে ছাপা বইয়েও দেখা যাবে। ক্যাথারিন ডিল ১৮১১ সনে ছাপা হিন্দুধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে লেখা ওয়ার্ডের বইটির অলংকরণ নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছেন। খুঁজলে এ-জাতীয় নমুনা আরও দেখা যাবে। তাছাড়া মুদ্রিত বইয়ের আকার-প্রকার, মুদ্রাকরের প্রতীক, নাম-পত্র, উৎসর্গ, পৃষ্ঠা সাজানোর পদ্ধতি, পাতার নম্বর, পৃষ্ঠায় সংকেত ব্যবহার—ছাপা বইয়ের ইতিহাস পর্যালোচনার সবই দরকারী বিষয়। এখানে সে-সব আলোচনার সুযোগ নেই। শুধু তাই নয়, সুশৃংখল গবেষণা ছাড়া সেটা সম্ভবও নয়। আমরা এখানে কতকগুলো স্থূল বিষয়ের কথাই উল্লেখ করতে পারি মাত্র। আগেই বলেছি এ-আলোচনা যথেষ্ট সুশৃংখল নয়। রাশি রাশি বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ যা চোখে পড়েছে তারই উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র।

হলহেডের ব্যাকরণের হরফ, সকলে একবাক্যে স্বীকার করেছেন,—মনোহর। পড়তে কোনও অসুবিধা নেই, অথচ দেখতেও সুন্দর। ব্যাকরণের প্রকাশকাল—১৭৭৮। তার পর দু' তিন দশক ধরে যত বইয়ে বাংলা হরফ দেখা গেছে বলতে গেলে সবই প্রায় ওই হরফের ছাঁদে। প্রথম ব্যতিক্রম—ফরসটারের **কর্নওয়ালিশ কোড**। প্রকাশকাল—১৭৯৩। কেরী সমেত মুদ্রাকরদের আদর্শ তখন কর্নওয়ালিশ কোড-এর হরফ। অবশ্য কাছাকাছি সময়ে ছাপা আইনের অন্য অনুবাদগুলোর হরফের সঙ্গে কর্নওয়ালিশ কোড-এর সাদৃশ্যও যথেষ্ট। তবে এর হরফ আরও ছোট, আরও পরিচ্ছন্ন—এই যা। তারই মধ্যে আর এক ব্যতিক্রম কিন্তু ১৭৯৩ সনে প্রকাশিত আপজনের **বোকেবিলারি**। তারপর

শ্রীরামপুর। শ্রীরামপুরে ও'রা গর্ব করেছেন তাঁরা যে হরফে **সমাচার দর্পণ** ছাপছেন তার চেয়ে হলহেডের বইয়ের অক্ষর ছিল তিনগুণ বড়। অর্থাৎ তাঁদের তৈরি হরফ অনেক ছোট, আরও সুন্দর। কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু একই সময়ে তাঁরা যে হরফে **দিগ্দর্শন** ছাপিয়েছেন তা কি সমান পরিচ্ছন্ন এবং সমান নাজুক? অথচ দুই কাগজের প্রকাশকালের মধ্যে মাত্র এক মাসের ব্যবধান। "দিগ্দর্শন" প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সনের এপ্রিলে, সমাচার দর্পণ সে-বছরই মে মাসে।

সুকুমার সেন মশাই লিখেছেন, হলহেডের ব্যাকরণের হরফের সঙ্গে ক্যালকাটা-গেজেটে মুদ্রিত হরফের বিশেষ পার্থক্য নেই, একমাত্র পার্থক্য 'জ' আর 'ট'-এর মধ্যে। ব্যাকরণের হরফের সঙ্গে সরকারী ছাপাখানার হরফে, চোখে পড়ার মতো পার্থক্য 'স্থ'-এ। হলহেড 'স্থ' বোঝাতে ব্যবহার করেছেন 'স্থ'। আপনজনের বইয়ে তাঁর কাছে অন্য রকম ঠেকেছে 'ট'। আমাদের মনে হয় সব হরফই সেখানে ঈষৎ অন্য ধরনের। শ্রীরামপুরের প্রথম দিককার ছাপার সঙ্গে কলকাতার ছাপার প্রধান তারতম্য, তিনি বলেন, পেট-কাটা 'ব'-এর বদলে 'র'-এর ব্যবহার। বস্তুত, কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা গেল শ্রীরামপুরের হরফের সঙ্গে পুরানো হরফের আকাশ-পাতাল তফাত। মূল প্রকৃতিতে হয়তো ঠিক ততখানি নয়, কিন্তু দৃশ্যত অনেকখানি।

সমসাময়িককালে ব্যবহৃত বাংলা হরফ সম্পর্কে হেমেন্দ্রকুমার সরকার লিখেছেন—"Like Halhed's Bengal Grammar, other early books are well printed but some letters are ill-formed. They are difficult to read. Many of the early Serampore works suffer from the same defects, ill-formed types. It may be that the typesetters were pushed to the extreme in the general hurry to accomplish as much as possible, or the bad quality of the paper was partially responsible for the poor results." তবে শ্রীরামপুর যে অচিরেই সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

নরম্যান এলিস মনে করেন—১৮২৮ সনে শ্রীরামপুরে ছাপা **আইন** বইটিতে যে ছোট ছোট শ্রীময় হরফ ব্যবহার করা হয়েছে তার সঙ্গে

লাইনোটাইপের নিকট আত্মীয়তা। **আইন** বইটির হরফ এবং পত্রবিন্যাস (মারজিন-এ খাটো মাপে বাক্য সাজানো) অবশ্যই দর্শনীয়। কিন্তু শ্রীরামপুরের কেরী-লাইব্রেরিতে রক্ষিত **কথোপকথন**-এর একটি সংস্করণ রয়েছে যা আরও ছোট হরফে ছাপা। ছাঁদ অবশ্য "আইন"-এর কাছাকাছি, কিন্তু হরফ আরও চিক্কণ। এটি "কথোপকথন"-এর চতুর্থ সংস্করণ। ছাপা হয়েছিল ১৮১৮ সনে। হয়তো, এই বিশেষ হরফই তৈরি হয়েছিল জন লসন-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী।

প্রসঙ্গত শ্রীরামপুরে ছাপা "আইন" সম্পর্কে আরও একটি কথা। আমরা জানি ১৭৯৩ সনে প্রকাশিত "কর্নওয়ালিশ কোড"-এর অনুবাদক ছিলেন—এইচ. পি. ফরসটার। এই 'আইন'-এর অনুবাদকও কি তিনিই? "কর্নওয়ালিশ কোড"-এর মতোই এটিতেও কিন্তু অনুবাদ শেষে লেখা রয়েছে—"A True Translation,—H. P. Forster."

দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন কলকাতার মুদ্রাকররাও। ১৮২০ সনে কলকাতার স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত **পত্র কৌমুদী**র পৃষ্ঠায় এমন হরফের নমুনাও রয়েছে যার সঙ্গে ১৮১৮ সনে প্রকাশিত এই "কথোপকথন"-এর দিব্যি মিল। "আইন" যদি হয় লাইনো এবং মোনো-হরফের পূর্বসূরী, তবে এ দুটি বই নিঃসন্দেহে "আইন"-এর অগ্রজ।

এভাবেই এগোতে এগোতে শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে বাংলা ছাপার হরফের বর্তমান চেহারা। হেমেন্দ্রকুমার সরকার মনে করেন বাংলা হরফের মান স্থির হয়ে যায় ১৮৫০ সনের মধ্যে। ইন্দিরা দাস "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় চিঠিতে বলেছেন বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বাংলা পাঠ্য বইয়ের হরফের একটা মান স্থির হয় শ্রীরামপুরের একটি ফাউণ্ড্রিতে বাংলা ১২৭৩ সনে। অর্থাৎ ১৮৬৬ সন নাগাদ। পুরনো বাংলা বই ঘাঁটাঘাঁটি করলে মনে হয় শেষোক্ত সময়টাই বোধহয় ঠিক। কারণ, ১৮৫১ সনে ছাপা "বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ"-এর পাতায় দেখি তিন ধরনের হরফ ব্যবহৃত হলেও র-ফলা (্র), য-ফলা (্য), অনুস্বর (ং), ঙ, এবং কিছু কিছু যুক্তাক্ষর (যেমন—ষ্ঠ, ল্প ইত্যাদি) রীতিমত বেঢপ। যেসব হরফ অন্য হরফের কাঁধে সওয়ার, কিংবা জড়িয়ে ধরেছে অন্যের পা—তাদের তখনও যেন বশে আনা যাচ্ছে না। তখনকার বিলাতী ছাপাতেও নানা বিসদৃশ

দৃশ্য। লন্ডনে ছাপা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত বাংলা বইয়ের তালিকাগুলোর কথাই ধরা যাক। সেখানে শ্রী, ৢ, ং, ্য, ঙ্ক, ত্ব, ৈ, এবং ঁ—যেকোনও পাঠকের চোখে পড়তে বাধ্য, আশপাশের অন্য হরফের সঙ্গে কোনও সামঞ্জস্য নেই এদের, যেন দলছাড়া।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত হরফের জগতে ন্যায় এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হল একদিন। মুদ্রাকর, প্রকাশক এবং পাঠক একসময় জানতে পারলেন কী কী হরফ আছে আমাদের তহবিলে এবং কেমন তাদের চেহারা। একেবারে একালে পৌঁছে বাংলা ১৩১১ সনে বিশ্বকোষ হরফ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাচ্ছেন—শ্রীরামপুরের অধর টাইপ ফাউণ্ড্রির বর্জাইস, স্মল পাইকা, পাইকা ও ইংলিশ ছাঁদের হরফগুলো সর্বাঙ্গসুন্দর। বিভিন্ন মুদ্রাকরগণ তা থেকে "ইলেকট্রো ম্যাট্রিক্স" তৈরি করে কাজ চালাচ্ছেন। "এছাড়া কালিদাস কর্মকারের অক্ষরের লঙ-প্রিমার ব্রিভিয়ার ও গ্রেট এণ্টিক এবং ইংরাজী উর্দ্দু ও হিব্রু প্রভৃতি ছাঁদের সকল প্রকার বাঙ্গালা অক্ষর এবং তারকনাথ সিংহ ইংরাজী সানশেরিফ ছাঁদে বাঙ্গালা ডবল গ্রেট ঢালাই করিতেছেন।" ওঁরা আরও জানিয়েছেন তখন কলকাতায় যেসব বাংলা হরফ লভ্য তার মধ্যে ছিল—ডবল গ্রেট, টু লাইন পাইকা, গ্রেট, গ্রেট এণ্টিক, ইংলিশ, পাইকা, স্মল পাইকা, লঙ্ প্রিমার, বর্জাইস ও ব্রিভিয়ার। শুধু তাই নয়, বাঙালীর উদ্যোগে ছাপার কলও তৈরি হচ্ছে তখন কলকাতায়। কলকাতায় তখন যেসব পুরানো প্রেস চলছিল তার মধ্যে সবচেয়ে মুদ্রাকর-প্রিয় ছিল নাকি 'চিলে প্রেস' বা কলম্বিয়ান প্রেস, ইম্পিরিয়াল প্রেস, আর অ্যালবিয়ন প্রেস। বলা নিষ্প্রয়োজন, সবই লোহায় গড়া ছাপার কল। ১৮৫৯ সনেই লঙ সাহেব লিখে গেছেন কাঠের ছাপাখানা আর দেখা যায় না বললেই হয়। তবে লোহার-কল সবই আসতো ইউরোপ থেকে। "বিশ্বকোষ" জানাচ্ছেন—স্বদেশী কলও তৈরি। "শিকদার কোম্পানি য়ুরোপীয়ের অনুকরণে নির্মিত বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র ঢালাই করিয়া একটি দেশীয় অভাব দূর করিয়াছেন।"

বিশ্বকোষ প্রকাশিত হওয়ার পর প্রায় পৌনে একশ' বছর পার হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে বাংলা হরফের চেহারা নিয়ে। এখনও হচ্ছে। এমনকি রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার আদলেও তৈরি হয়েছে বাংলা হরফ। উদ্যোগী হরফ-নির্মাতা অতএব

একালেও আছেন। আমরা অন্তত একটি প্রতিষ্ঠানকে জানি উনিশ শতকে যাত্রা শুরু করেও এখনও যাঁরা প্রাণে ডগমগ,—চতুর্থ পুরুষে পেঁৗছেও নতুন নতুন হরফের সন্ধানে অব্যাহত যাঁদের সাধনা।

চালু ফাউণ্ড্রিগুলোর নমুনা-বইয়ের পাতা ওলটালে হঠাৎ মনে হতে পারে বাংলা হরফ বুঝিবা বৈচিত্র্যে আজ তুলনাহীন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রোমান হরফের নমুনাগুলোর ওপর চোখ বুলালে সে-ভুল ভেঙ্গে যায়। বোঝা যায়, কেন বাংলা হরফের জন্য প্রগতিশীল মুদ্রাকরের ক্ষুধা এখনও অতৃপ্ত।

বাংলা হরফশিল্পে একালে সত্যিকারের যুগান্তকারী ঘটনা বোধ-হয় লাইনো এবং মোনো টাইপের প্রচলন। লাইনো-মেশিনে বাংলা হরফ সাজানোর কাজ শুরু হয় ১৯৩৫ সনের ২৬ সেপ্টেম্বর। সে দিনটি ঐতিহাসিক। কারণ সেদিন থেকেই যন্ত্রে হরফ সাজাবার আধুনিক কৌশল আমাদের আয়ত্ত। এ-ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার। লাইনো যন্ত্রে বাংলা অক্ষর সাজাবার শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিদেশী কোম্পানির প্রতিনিধি মে. জে. মে. কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন তাঁর অবদানের কথা। তিনি ঘোষণা করেন—“শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সহায়তায় আমার কোম্পানী যন্ত্র সাহায্যে বাঙ্গালা অক্ষর গ্রথিত করিবার উপায় বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছে।” একই অনুষ্ঠানে হ্যারি গোভিল বলেন—“প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে যন্ত্র সাহায্যে ইংরাজী অক্ষর গাঁথিবার জন্য ভারতবর্ষে লাইনো মেশিন প্রবর্তিত হয়। আজ বাংলা ভাষায় প্রথম লাইনো টাইপ প্রবর্তিত হইল। শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের অক্লান্ত চেষ্টায় ইঁহা সম্ভব হইয়াছে। শ্রীযুত রাজশেখর বসু তাঁহাকে এ-কার্যে সহায়তা করিয়াছেন। মূল অক্ষরগুলির আকৃতি অংকন করিয়াছেন শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেনের সহায়তায় শ্রীযুত এস. কে. ভট্টাচার্য।”

তার কয়েক বছরের মধ্যেই মোনোটাইপ চালু হয় বাংলা ছাপাখানায়। সেটা সম্ভবত ১৯৩৯ সনের ঘটনা। মোনোটাইপের হরফ শিল্পী কে বা কারা ছিলেন তা আমরা জানি না। ক'বছর আগে (১৯৬৮) ও'রা কিছু নতুন ছাঁদের হরফ তৈরি করেছেন। শিল্পী—সুহৃদ চক্রবর্তী। কলকাতার

হরফ তৈরির কারখানাগুলোতে তিনি সুপরিচিত। উপস্থিত চক্রবর্তী মশাই কলকাতার একটি বিখ্যাত হরফ-ফাউণ্ড্রির শিল্পী।

কত কাণ্ডই হয়েছে। এখনও হচ্ছে। তবু মনে হয় নরমান এলিস সাহেবের কথাই ঠিক, ভারত এখনও যথেষ্ট সংখ্যায় সত্যিকারের সৃজনশীল হরফ-শিল্পী খুঁজে পেল কই? তিনি আক্ষেপ করেছেন—"India has no Bodini, Garamond, Gill or other type designer of the West. India has the mechanical resources to print for her increasingly literate population—and no specifically Indian means to bridge the gap between the mechanics of printing and reader's mind."

দ্রষ্টব্য : *Books in the Indian Languages*—Hemendra Kumar Sarkar, *Early Indian Imprints*—Katharine Smith Diehl, 1964 ; **বিশ্বকোষ** (পঞ্চদশ ভাগ)—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত, ১৩১১ ; *Indian Typography*—Norman A. Ellis, *The Carey Exhibition of Early Printing and Fine Printing*—National Library, Calcutta, 1955 ; *Early Printers and Publishers of Calcutta*—Sukumar Sen, *Bengal Past and Present*, January—June, 1968 ; **আনন্দসংগী** (২য় সংস্করণ, ১৯৭৫)—প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। লাইনো টাইপ-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিবরণ এই বইটিতে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

৫৮। বিলাতেও বেশ কিছু সংখ্যক বাংলা বই ছাপা হয়েছে। বলতে গেলে সবই ছাপা হয়েছে উনিশ শতকে। অবশ্য সেখানে ভারতীয় ভাষায় হরফ তৈরির উদ্যোগ আয়োজন শুরু হয় অষ্টাদশ শতকেই। উইলিয়াম বোল্টস-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি বাংলা হরফ তৈরি করাতে চেয়েছিলেন ইংরাজ হরফ-নির্মাতা জোসেফ জ্যাকসনকে দিয়ে। জ্যাকসন হরফ তৈরির কাজ শিখেছিলেন উইলিয়াম ক্যাসলনের বিখ্যাত হরফ ঢালাই কারখানায়। এই ক্যাসলন কোম্পানিই বিলাতে ১৮২৫ সনে দেবনাগরী হরফ তৈরি করেন। তার আগের বছর এডমণ্ড ফ্রাই তৈরি করেন গুজরাটী হরফ। শ্রীরামপুরের মিশনারীরা ক্যাসলন এবং ফ্রাই

দুই কোম্পানির কাছেই প্রস্তাব পেশ করেছিলেন হরফ তৈরি করে দেওয়ার জন্য। ক্যাসলন কোম্পানি এক একটি বাংলা হরফের জন্য দাম চেয়েছিলেন নাকি এক গিনি। ও'রা পাঁচশ' পাউন্ড খরচ করে বিলাত থেকে এক প্রস্থ ফার্সি হরফ আনিয়েছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রিটেনে তখন ভারতীয় হরফ তৈরি করছিলেন ফ্রাই এন্ড ফিগিনস। তাঁদের কাছে সন্ধান নিয়ে জানা গেল ৩০০ হরফের একটি সংক্ষিপ্ত দেবনাগরী সাট তৈরি করাতেও খরচ পড়বে কমপক্ষে ৭০০ পাউন্ড। অথচ শেষ পর্যন্ত ও'রা শ্রীরামপুরেই ৭০০ হরফের একটি ফাউন্ট তৈরি করিয়েছিলেন মাত্র ১০০ পাউন্ড খরচ করে।

সে যাই হোক, অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে লন্ডনে ভারতীয় ভাষার হরফ দুর্মূল্য হলেও একেবারে দুষ্প্রাপ্য যে ছিল না এসব খবরাখবর থেকে সেটা বোঝা যায়। তবে বাংলা হরফে বই ছাপা শুরু হয় বেশ কিছুকাল পরে,—উনিশ শতকের প্রথম দিকে। বিলাতে বাংলা বইয়ের অন্যতম মুদ্রাকর স্টিফেন অস্টিন অ্যান্ড সন্স। ও'রা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত কলেজের জন্য নানা ভারতীয় ভাষায় বই ছাপতেন। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের স্টাইলে এই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০৬ সনে। প্রথমে তার ঠিকানা ছিল হার্টফোর্ড, তিন বছর পরে—হেলিবারি। স্টিফেন অস্টিন-এর সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের স্বীকৃতি রয়েছে বোধহয় তাঁদের কোম্পানির সুন্দর মনোগ্রামটিতেও। তাতে প্রাচ্য অলঙ্করণের কেন্দ্রে মুদ্রিত একটি হাতির ছবি। তবে শুধু এই একটি কোম্পানি নয়, তৎকালে বিলাতে বাংলা ছাপায় হাত লাগিয়েছিলেন আরও কেউ কেউ। এইচ. এইচ. উইলসন-এর **দি মেঘদূত অর ক্লাউড ম্যাসেঞ্জার**-এর (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৪৩) মুদ্রাকর রিচার্ড ওয়াট জানাচ্ছেন তিনিও "প্রিন্টার টু ইস্ট ইন্ডিয়া কলেজ"। এই বইটিতে অবশ্য বাংলা হরফ নেই, তবে দেবনাগরী প্রচুর। বাংলা যে ও'রা আদৌ ছাপেননি একথা জোর দিয়ে বলা শক্ত।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত বাংলা বইয়ের তালিকার ওপর চোখ বুলাতে গিয়ে বিলাতে ছাপা যেসব বাংলা বইয়ের নাম আমাদের চোখে পড়েছে তার মধ্যে আছে: রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের **মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং** প্রকাশকাল—১৮১১। বইটি শ্রীরামপুরে আত্ম-

প্রকাশ করে ১৮০৫ সনে। দ্বিতীয়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের লেখা—**শ্রীবিক্রমাদিত্যের বত্রিশ পুত্তলিকা সংগ্রহ**। প্রকাশকাল—১৮১৬। মুদ্রাকর—গ্রেট কুইন স্ট্রীটের সেই কক্স অ্যান্ড বেইলিস। লণ্ডনে এর আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩৪ সনে। শ্রীরামপুরে "বত্রিশ সিংহাসন"-এর প্রথম প্রকাশ ১৮০২ সন। তাছাড়া হটন (জি. সি.) সম্পাদিত একটি বাংলা রচনার সংকলন লণ্ডনে প্রকাশিত হয় ১৮২২ সনে। সংকলনটিতে চণ্ডীচরণ, মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতির রচনা ছিল। চণ্ডীচরণের **তোতা ইতিহাস** 'লন্দন রাজধানীতে চাপা' হয় ১৮২৫ সনে। সজনীকান্ত দাস লিখেছেন, ১৮১১ সনেও লণ্ডনে একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির প্রথম শ্রীরামপুর সংস্করণ—১৮০৫। ১৮৩৩ সনে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত আর একটি স্মরণীয় বই সার গ্রেভস সি. হটন-এর বাংলা-সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান। (*A Dictionary, Bengali and Sanskrit, Explained in English etc.*—Sir Graves C. Haughton.) কোম্পানির পৃষ্ঠপোষণায় প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার এই বিশাল অভিধানটি ছেপেছিলেন গ্রেট কুইন স্ট্রীটের জে. এল. কক্স এণ্ড সন। বইটির মুদ্রণ পারিপাট্য দেখবার মতো। এ-ছাড়া আরও কিছু কিছু লণ্ডনে ছাপা বাংলা বইয়ের হয়তো সন্ধান মিলতে পারে। যেমন সজনীকান্ত দাস উল্লেখিত ডানকান ফরবেস সাহেবের **বেঙ্গলি রিডার**। লণ্ডনে এটি ছাপা হয়েছিল—১৮৬২ সনে। আমরা এখানে কয়েকটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত পেশ করলাম মাত্র। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের যে তালিকা থেকে বইগুলোর খবর জানা গেল সেগুলোতেও কিন্তু বাংলা হরফের ব্যাপক ব্যবহার। জে. এফ. ব্লুমহার্ট (J. F. Blumhardt) সংকলিত তালিকাটির প্রথম খণ্ডের মুদ্রাকর হার্টফোর্ডের সেই স্টিফেন অস্টিন এণ্ড সনস। প্রকাশকাল ১৮৮৬। দ্বিতীয় খণ্ডটির মুদ্রাকর আবার উইলিয়াম ক্লাউয়েস এণ্ড সন্স। প্রকাশকাল ১৯১০। তৃতীয় খণ্ডের মুদ্রাকর ওঁরাই।

দ্রষ্টব্য : *History of the old English Letter Foundries etc.* —A. F. Johnson, 1952 ; *Printing and the Mind of Man,* Catalogue of An Exhibition at B. M. Etc., London, 1963 ; *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward,* (2

vols) J. C. Marshman, 1859; *Catalogue of Bengali Printed Books in the Library of the British Museum,* (vol-1)—J. F. Blumhardt, 1886; **বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা**—মুহম্মদ সিদ্দিক খান, ঢাকা, ১৩৭১; **বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস**—সজনীকান্ত দাস, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৬৯।

৫৯। দৃষ্টান্ত হিসাবে রামকমল সেনের কাহিনী উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর বিখ্যাত ইংরাজী-বাংলা অভিধানটি প্রকাশের জন্য তিনি যা করেছিলেন তার বুঝি তুলনা হয় না। অভিধানের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় সবিস্তারে তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর দুঃখের কাহিনী। সে-কাহিনী আমাদের প্রকাশনার ইতিহাসে এক অতুলনীয় গৌরবের কাহিনীও বটে।

রামকমলের অভিধান জনসনের বিখ্যাত ইংরাজী অভিধানের (টড সংস্করণ) বঙ্গানুবাদ। দীর্ঘ সাধনায় অনুবাদের কাজ শেষ করে তিনি হাত দিলেন ছাপার কাজে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বইটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বটে, কিন্তু গ্রাহকদের কাছ থেকে আগাম চাঁদা বিশেষ মেলেনি। তবু তিনি ঝুঁকি নিয়েই বইটি ছাপাতে উদ্যোগী হলেন। এসব ১৮১৭ সনের কথা। সেকালে বই ছাপানো মানে পাণ্ডুলিপিটি ছাপাখানার পরিপরিচালকদের হাতে তুলে দেওয়া নয়। অনেক সময় হরফ থেকে শুরু করে কাগজ সংগ্রহ—সবই করতে হতো লেখককে। রামকমল নিজে তৈরি করালেন বাংলা হরফ। কলকাতার একটি ছাপাখানায় সেই হরফ সহযোগে ছাপা হল অভিধানের ১১৬ পৃষ্ঠা। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—"One hundred and sixteen pages printed into a fount of Bengalee types prepared for the purpose under my own superintendence. . . ."। লেখক নিজে দাঁড়িয়ে তাঁর বইয়ের জন্য হরফ তৈরি করাচ্ছেন,—এ-দৃশ্য কল্পনা করতেও রোমাঞ্চ হয়। তবু শেষ পর্যন্ত বইটি এখানে ছাপানো গেল না। ছাপাখানার পরিচালকরা আরও লাভজনক ভেবে দৈনিক কাগজ ছাপায় মন দিলেন। লেখক তাঁদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে ছাপানো কাগজগুলো নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। তারপর ঘুরতে ঘুরতে শ্রীরামপুরে। কেরী বললেন—ঠিক আছে, আমরা ছাপিয়ে দিচ্ছি। স্বয়ং কেরী আর মার্সম্যান প্রুফ দেখে দিলেন ফর্মার। কিন্তু ছাপা দেখে রামকমল বিমূঢ়। আগের ১১৬ পাতার সঙ্গে শ্রীরামপুরের

ছাপার কোনও মিল নেই। না কাগজে, না হরফে। শ্রীরামপুরের ও'রা মেনে নিলেন—হ্যাঁ, এই বই নতুন ছোট হরফেই ছাপা সংগত। তাতে তাঁদের আপত্তি নেই। তবে একটি শর্ত আছে ;—আগেকার ছাপা বাতিল করে দিতে হবে। রামকমল তাতেই রাজি হলেন। ইতিমধ্যে টড সংস্করণ অভিধান পেঁছে গেছে দেশে। সুতরাং, পাণ্ডুলিপিও সংস্কার করতে হয়, নতুন নতুন শব্দ যোগ করতে হবে অভিধানে। রামকমল তাতেও পিছুপা হলেন না। নতুন করে লিখে নতুন হরফে শ্রীরামপুরে তৈরি কাগজে ছাপা শুরু হল তাঁর অভিধান। এমন সময় হঠাৎ বিপর্যয়। কেরী-পুত্র ফেলিক্স মারা গেলেন। তাঁর দায়িত্বেই ছিল অভিধান ছাপার কাজ। আচমকা কাজ বন্ধ। শ্রীরামপুর প্রেসে ও'রা নিজেদের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু রামকমল সেনের অভিধানের কথা যেন তাঁরা ভুলেই গেছেন। ও'রা জানালেন—ওয়ার্ড দেশে গেছেন, তিনি ফিরে না এলে কিছু করা যাবে না। ওয়ার্ড ফিরে এলেন। প্রথমে কিছুদিন কেটে গেল তাঁর ছাপাখানা গোছাতে। তারপর নিজের বই ছাপাতে। বছর খানেক এভাবেই কেটে গেল। রামকমলের অভিধানের বাকি কাজে হাত দেওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু। বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়। শেষ পর্যন্ত নয় বছর পরে তিনি হাতে পেলেন ৩৫০ পৃষ্ঠা। ইতিমধ্যে কাগজ বিবর্ণ হয়ে গেছে, শব্দ পড়া দুঃসাধ্য। জে. সি. মার্সম্যান বললেন—এই কাগজে এই হরফে কিছুতেই আমি তোমার বই ছাপাতে পারব না। তাতে আমাদের ছাপাখানার বদনাম হবে। সুতরাং, আবার নতুন করে শুরু হল ছাপার কাজ। যাকে বলে কেঁচে গণ্ডুষ। রামকমল কিন্তু তবু অদমনীয়। অবশেষে ষাট হাজার শব্দের তাঁর বিশাল অভিধান (১১০২ পৃষ্ঠা) দুই খণ্ডে প্রকাশিত হল। প্রথম খণ্ডের প্রকাশ—১৮৩০। দ্বিতীয় খণ্ড সহ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ বইটি পাঠকের হতে পেঁছায় ১৮৩৪ সনে। তার অর্থ এই বই ছাপাতে সময় লেগেছে তাঁর দীর্ঘ সতের বছর। ভাবা যায়?

দ্রষ্টব্য : *Dictionary in English and Bengalee,* (Vol I), —Ram Comul Sen, 1834.

৬০। বাংলা বইয়ে মুদ্রণ-প্রমাদ সম্পর্কে এই উক্তিটি পরিমল গোস্বামীর। **যাঁদের দেখেছি,** (১৩৭৬)। আর বটতলার ছাপা বিষয়ে ওই প্রবচনটি ("শাবল কাবল ভূষি ভূষি সে কাবল" ইত্যাদি) উদ্ধৃত করেছেন সুকুমার

সেন তাঁর বটতলা বিষয়ক বাংলা প্রবন্ধে। পুরানো বাংলা বইয়ে ছাপার ভুল কিন্তু কারও কারও বিচারে বেশ কম। হেমেন্দ্রকুমার সরকার লিখেছেন—

"The printer's devil played his part in early printing, but being just an infant he merely left marks of playful pranks here and there. What surprises one is that there are not many more mistakes in spelling, considering that most of the people in our early presses have been people with little education. When one remembers that just the presence or absence of a dot transforms a letter from *r* to *b* or the other way round, it is not to be wondered at if early books contain a few mistakes."

তা ছাড়া, ছাপার ভুল কি একালেই বইয়ের পাতা থেকে পুরোপুরি নির্বাসিত? বিলাতী মুদ্রাকর এ-প্রসঙ্গে খুঁতধরা পাঠককে স্মরণ করতে বলেছেন কবি পোপের দুটি ছত্র—

"Whoever thinks a faultless piece to see,/Thinks what ne'er was, nor is, nor ever shall be."

ছাপার ভুল চিরকাল ছিল, আছে, থাকবে,—সবিনয়ে মুদ্রাকরের এটাই নিবেদন।

দ্রষ্টব্য: *Early Indian Imprints*—K. S. Diehl, 1964; *Typographia*—John Johnson, 1824.

৬১। বাংলা প্রকাশনার ইতিহাসে বটতলার অবদান একাধিক। প্রথম অবদান বোধ হয় এক আনা এবং ছয় পয়সা দামের সেই বইগুলো সুকুমার সেন যেগুলিকে বলেছেন—"আদিরসাল ইতরভাবালু পুস্তিকা"। যেমন **—অবাক কলি পাপে ভরা, কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, কোনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলি বাঁধে, আপনার মুখ আপনি দেখ, হুড়কো বৌএর বিষম জ্বালা, কলির বৌ হাড়-জ্বালানী, আঙুল ফুলে কলাগাছ, দেক্‌কে শুনে আক্কেল গুড়ুম, কি মজার শনিবার, হদ্দ মজা রবিবার, কি দুখ সোমবার, ইয়ং বেঙ্গল ক্ষুদ্র নবাব, উরুৎ বেয়ে রক্ত পড়ে চোখ গেল রে বাপ,** ইত্যাদি

ইত্যাদি। একজন গবেষক (ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী) ১৮৫৪ থেকে ১৮৯৯ সনের মধ্যে বটতলা থেকে প্রকাশিত সাড়ে চার শ'র ওপর বাংলা প্রহসনের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর তৈরি তালিকায় আছে অনিশ্চিত খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত আরও খান পঞ্চাশেক বইয়ের নাম। তালিকাটি তবু অসম্পূর্ণ বলেই মনে হয়। সাহিত্যে যদি এগুলোকে আবর্জনা বলেও গণ্য করা হয় তবে তার দায়িত্ব বোধ হয় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা কোনও বিশেষ একজনের কাঁধে চাপানো যায় না। রুচিবিকৃতির অভিযোগ তুললে দায় কিন্তু গোটা সমাজের। আমাদের মনে হয় সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নির্ণয়ে বটতলার এই সস্তা-সাহিত্যের পর্যালোচনা সহায়ক হতে পারে। তা ছাড়া বটতলার এই সাহিত্যে সমসাময়িক সমাজও বোধ হয়—হোক না ঈষৎ বিকৃত,—প্রতিবিম্বিত। অন্য কথায় গুরুত্ব সহকারে বটতলার অবদান যাচাই করা এক অর্থে আপনার মুখ আপনি দেখা। সে মুখচ্ছবি অবশ্য আজকের নয়, উনিশ শতকের কলকাতার সমাজের। ভাঙা-আয়না হলেও বটতলা সাহিত্য অতএব আধুনিক গবেষক জঞ্জাল স্তূপে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন না।

বটতলার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশনে হিন্দু মুসলমান ঐক্য। সুকুমার সেন তাঁর বটতলা-বিষয়ক প্রবন্ধে এ দিকটার কথা আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন—"বটতলার হিন্দু প্রকাশকেরাও বহু ইসলামি বাংলা গ্রন্থ ছাপাইয়াছিলেন। ইসলামি বাংলা সাহিত্য প্রচারে অগ্রণী ইঁহারাই। হিন্দু প্রকাশকরা ছাপাইতেন পুরানো রচনা, মুসলমান প্রকাশকরা প্রধানত নূতন বই এবং পূর্ববঙ্গে প্রচলিত পুরানো কাব্য। পঁচিশ তিরিশ বছর আগেও রামলাল শীল বহু মুসলমানি বই সচিত্র ছাপাইয়াছিলেন—সৈয়দ হামজার 'হাতেম তাই', গরিবুল্লার 'ইউসুফ-জেলেখা', এরাদৎ-উল্লার 'গোলেবকাওলি'।..." অন্য দিকে মুসলমান প্রকাশক কাজী সাহা ভিক এমনই বিবেচনাশীল যে হিন্দুরা যাতে ভাষার জন্য তাঁর প্রকাশিত বইয়ের রস থেকে বঞ্চিত না হন সেজন্য তিনি পন্ডিত দিয়ে মুসলমানী বাংলাকে "বাংলা পদ্য ছন্দে সাধুভাষায় রচনা" করাতেও পিছুপা হচ্ছেন না।

বটতলার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য—সৎসাহিত্যের প্রচার। তাঁরা আবর্জনা যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনই সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের ঘরে পৌঁছে

দিয়েছেন—প্রাচীন কাব্য, সাহিত্য, ধর্ম পুস্তক। সুকুমার সেন বলেন—"তবু আজ একথা ভুলিলে চলিবে না যে এই ছাপা পড়িয়াই আমাদের প্রপিতামহী-পিতামহীরা ইস্কুল কলেজের ধার না-ধারিয়াও তাঁহাদের ইংরাজী-পড়া পতিদেবতাদের তুলনায় সত্যিকারের শিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং এমনি তুচ্ছতা-অবজ্ঞতার অন্তরালে থাকিয়াই কৃত্তিবাস-কাশী-রাম-মুকুন্দরামের কাব্য, চৈতন্য চরিতামৃত-চৈতন্য ভাগবত, কৃষ্ণমঙ্গল রাধিকামঙ্গল, নারদসংবাদ-প্রহ্লাদচরিত্র, নরোত্তমবিলাস-ভক্তমাল, গীত-চিন্তামণি-পদকল্পলতিকা পৌর ও জানপদ জনসাধারণের চিত্ত সরস ও উন্নত করিয়া আসিয়াছে। অথচ তখন দেশের গণ্যমান্যেরা, ইংরেজি শিক্ষাভিমানীরা, বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের বাহিরে বাংলা সাহিত্যের কোন ধারই ধারিতেন না।" সেদিক থেকে বিচার করলে বটতলার স্নিগ্ধ ছায়ায় লালিত এ দেশের জনসাধারণের এক মুখ্য অংশ।

বটতলার প্রকাশকরা গ্রামে গঞ্জে মুদ্রিত বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন তাও অভিনব। তাঁরা ফেরিওয়ালা নিযুক্ত করতেন। তাঁরা বইয়ের বোঝা পিঠে নিয়ে কলকাতার অলিতে গলিতে তো বটেই, দূর দূর গ্রামে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তেন। বছরে আট মাস চলতো এভাবে বই ফিরির পালা। বর্ষায় চাষবাস, ক্ষেতখামারের কাজ। রোজগার মন্দ হত না। এক একজন নাকি মাসে একশ' টাকা ঘরে আনতেন। লন্ডন এবং বটতলার ফেরিওয়ালাদের সম্পর্কে টুকিটাকি অনেক খবর রেখে গেছেন লঙ সাহেব। তাঁর বর্ণনায় বটতলার ছাপাখানা, দোকান, সব জীবন্ত। একটু পড়ে শোনাচ্ছি—

> "The Native Presses are generally in bylanes with little outside to attract, yet they ply a busy trade. Of late educated natives have opened shops for the sale of Bengali Works, and we know the case of one man who realizes Rupees 500 per month profit, but the usual mode of sale is by hawkars, of whom there are more than 200 in connection with the Calcutta Presses. These men may be seen going through the native part of Calcutta and the adjacent town with a pyramid of

books on their head. They buy the books themselves at wholesale price, and often sell them at double the price which brings them in probably 6 or 8 Rupees monthly. Though we know of a man who realizes by book hawking more than 100 Rupees monthly. . . . The Natives find the best advertisement for Bengali book in a 'living agent' who 'shows the book itself'. . ."

১৮৩৫ সনের একটি নড়বড়ে ছাপাখানার বর্ণনাও উদ্ধৃত করেছেন তিনি তাঁর বিবরণে। বিবরণটি অনেকটা এই রকম : পুরানো কাঠের যন্ত্র। হরফ ব্যবহারে ব্যবহারে জীর্ণ। ফেলে দেওয়ার সময় কবে পার হয়ে গেছে, তবু তাই দিয়ে চলছে ছাপার কাজ। কাগজ মানে, যাকে বলে বাজে কাগজ। কোনও মতে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। (সুতরাং "সকল কারণ তুমি তুমি সে কারণ" যদি "শাবল কাবল ভূষি ভূষি সে কাবল" হয়ে যায় তবে দোষ দেওয়া যায় কি?) কম্পোজিটারের মজুরিও খুবই কম, চারটে কোয়ার্টো পৃষ্ঠা কম্পোজ করে মেশিনে পাঠালে মিলবে মাত্র এক টাকা। সে মজুরিও বকেয়া।

বটতলার আর এক বাহাদুরি সস্তায় বই পড়ানো। সে কথা পরে। সুকুমার সেন বটতলার ফেরিওয়ালাদের আরও একটি কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত সে-কাহিনীটিও শোনার মতো। তিনি লিখেছেন—"বটতলার বই ফেরিওয়ালারা আর এক কার্য করিয়া গিয়াছে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের অজ্ঞাতসারে। বাংলা পুথির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ভাণ্ডার, যাহা এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি তাহা ইহাদেরই তিল সঞ্চিত বল্মীকশৈল। এই সংগ্রহ করিয়াছিলেন বিশ্বকোষ-সংকলয়িতা নগেন্দ্রনাথ বসু। বটতলার হকাররা পাড়াগাঁয়ে বই বেচিতে গিয়া অনেক সময় নগদ মূল্য না-লইয়া ছাপা বইয়ের বদলে পুরানো পুথি লইয়া আসিত। ইহাদের নিকট হইতে এইসব পুথি কিনিয়া লইতেন নগেন্দ্রনাথ। এমনি করিয়াই বাঙালীর সংস্কৃতির এই ভাণ্ডারটি উপচিত হইয়াছে।"

বটতলার কাছে অতএব ঋণ আমাদের অনেক।

দ্রষ্টব্য : **বটতলার বেসাতি**—সুকুমার সেন, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫৫ ; **কলকাতা কালচার**—বিনয় ঘোষ, ১৩৬৩ (এই বইটি বিনয় ঘোষের **কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত** গ্রন্থে (১৯৭৫) পুনর্মুদ্রিত।) ; **বই কেনা**—নিখিল সরকার, দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩-১৪ আগস্ট, ১৯৭৫ ; **সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন**—ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী, ১৯৭৬ ; **বাংলা নাটকের প্রথম আমল**—দুশান জবাভিতেল, চতুষ্কোণ, বিশেষ নাটক সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৮৩ ; *Publications in the Bengali Language in 1857*—Rev. J. Long, 1859.

৬২। এই ধরনের অনেক বিজ্ঞাপন-বিজ্ঞপ্তির নমুনা রয়েছে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত **সংবাদপত্রে সেকালের কথার** পৃষ্ঠায়। একটি নমুনা শোনাচ্ছি। ১৮১৯ সনের ৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হচ্ছে :

> "সকল বিশিষ্ট লোকেরদিগকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে।—শ্রীভগবদ্গীতা গ্রন্থ সংস্কৃত অষ্টাদশ অধ্যায় এবং তাহার প্রতি শ্লোকের যথার্থ অর্থ পয়ারে প্রতি সংস্কৃত শ্লোকের নীচে অত্যুত্তমরূপে মোং কলিকাতার বাঙ্গাল গেজেটি আপিসে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাপা করিয়াছেন। সে পুস্তকের মূল্য ৪৷৷৹ সাড়ে চারি টাকা প্রতি পুস্তক বিক্রয় হইতেছে যে ২ মহাশয়-দিগের ঐ পুস্তক লইতে মানস হইবেক তাঁহারা মোং কলিকাতার জোড়াসাঁকোর পূর্ব জোড়া পুখুরিয়ার নিকট শ্রীযুত জয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া লইবেন। প্রতি পুস্তকের মূল্য জেলেদ সমেত লইলে ৪৷৷৹ সাড়ে চারি টাকা দিতে হইবেক জেলেদ সমেত না লয়েন চারি টাকা দিলে পুস্তক পাইবেন।..."

অধিকাংশ বিজ্ঞাপনে বা এ-জাতীয় খবরে বইয়ের বিষয়, বৈশিষ্ট্য, কাগজ-ছাপা-বাঁধাই, দরদাম, প্রাপ্তিস্থান সবই পরিষ্কার বলে দেওয়া হত। যেমন—"সে পুস্তকের শ্লোক সংখ্যা ৩০০ তিনশত এবং তাহার পয়ার ৫০০ পাঁচ শত এবং উত্তম অক্ষরে পাটনাই কাগজে ছাপা হইয়াছে তাহার মূল্য প্রতি পুস্তক তিন টাকা। অতএব যাহার লওনের ইচ্ছা হয় তিনি লালদিঘীর নিকটে কালেজের ঘরে কালেজের কেরাণি শ্রীযুত জগন্মোহন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট লোক পাঠাইলে পাইবেন।" আর একটি ইস্তাহারে

সবশেষে বলা হয়েছে—“এই গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে অনেকের উপকার হইবেক যেহেতু যিনি এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন তিনি অতিজ্ঞানবান।”

বটতলার লেখক এবং প্রকাশকদের কিছু ইস্তাহারের নমুনা উদ্ধৃত করেছেন সুকুমার সেন তাঁর বটতলা বিষয়ক প্রবন্ধে। বটতলার আদি-যুগের পদ্যের বিজ্ঞাপনগুলো সত্যই পড়ে শোনাবার মতো। “আজায়ের ছোলামানী” নামে একটি বইয়ের বিজ্ঞাপনের আদি ও অন্তে ছিল—

“কিবা আছে এর বিচে পড় ভাই তাহা
শায়ের ছাহেব এতে লিখিলেক যাহা।...
আওরোতের দুধ জোয়াদা করিতে
তর্কিব লিখিল ভাই বই কেতাবেতে।
এইরূপে লাখে লাখে বিমারির দাওয়া
লিখিল কেতাব মধ্যে সব আছে রওয়া।
কেতাব কিনিয়া সবে খেয়াল করহ
তদ্বির করিয়া সবে ফায়দা দেখহ।”

আর একটি বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে—

“কড়ায়্যাতে কসাইর মছজেদ আছে জেথা
মছজেদ সামেল বাটী জানিবেন সেথা।
বাড়িঘর কোথা ফকিরখানেতে গোজরান
এইতক হলে জানাইনু মেহেরবান।” ইত্যাদি।

বাংলা-বইয়ের বিজ্ঞাপনে বটতলার প্রকাশকরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছেন একেবারে এ-কাল অবধি। পঞ্জিকা এবং নিজেদের পুস্তক-তালিকায় তাঁদের বিজ্ঞাপনের ভাষা এখনও উপভোগ্য। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের **বঙ্কিমবাবুর গুপ্তকথার** বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে—“রোমাঞ্চকর প্রলয়ংকর ঘটনা—ঘটনার তরঙ্গ—তরঙ্গের পর তরঙ্গ—ঘটনার প্রবাহে ভাসুন। নানাবিধ অভিনব চরিত্রের সমাবেশ,—যাহা কখনও পড়েন নাই—তাহাই একবার পড়ুন!!...” বটতলার আর একটি বিজ্ঞাপন—“ছাপা হইতেছে—অপেক্ষা করুন, ‘পাষণ্ড-দলন’ প্রণেতার সেই সর্বজনপ্রিয় নূতন নাটক...ইহার রচনা যেমন করুণরসময়, তেমনি ললিত, মধুর, প্রাণময়,—ঘটনা সৃষ্টি অপূর্ব!—ঘটনার বিরাট ঘাত প্রতিঘাত!—ভাব

বৈচিত্র্য, নৃত্যগীত লালিত্য, আনন্দের মন্দাকিনী প্রবাহ,—সকলই অপূর্ব, সকলই সুন্দর, সকলই অতীব মনোহর!!...”

পাঠক এরপর যদি অপেক্ষা করতে না চান তবে তাঁকে বোধহয় দোষ দেওয়া যায় না!

দ্রষ্টব্য : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত **সংবাদপত্রে সেকালের কথা** (২ খণ্ড) ; সুকুমার সেনের উল্লেখিত **বটতলার বেসাতি** প্রবন্ধ। বটতলার বিজ্ঞাপনের অন্য নমুনাগুলো প্রকাশকদের পুরানো পুস্তক-তালিকা থেকে সংগৃহীত।

৬৩। প্রসঙ্গত বইয়ের দাম সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। ছাপাখানার আদি যুগে বইয়ের দাম ছিল স্বভাবতই খুব বেশি। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে এ-দেশে ছাপা দু' চারটি বইয়ের দামের কথা শুনলেই পরিস্থিতিটা অনুমান করা যাবে। ১৭৮৬ সনে প্রকাশিত চার্লস উইলকিনস-এর ভাগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদের দাম ধার্য হয়েছিল ১ এক গোল্ড মোহর! ১৭৭২ সনে কালিদাসের ঋতুসংহার যখন বাংলা হরফে ছেপে বের হয় তখন বিজ্ঞাপনে বলা হয় দাম—দশ টাকা। দশ টাকা, বলা বাহুল্য, সেকালে অনেক টাকা। ১৭৯৩ সনে ছাপা আপজনের "বোকেবিলরি”র দাম সেদিক থেকে বেশ সস্তা, মাত্র চার টাকা। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে গিলখ্রীস্ট-এর অভিধান এবং ব্যাকরণ (তিন খণ্ডে) বিক্রি করা হয়েছিল চল্লিশ টাকায়। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে—অন্য বইয়ের তুলনায় দাম খুবই সস্তা। গ্রাহকরা আরও দশ টাকা করে বেশি দিলে বিলক্ষণ উপকার। ১৭৯৯ সনে প্রকাশিত ফরসটারের বিখ্যাত অভিধানের প্রথম খণ্ডের দাম ছিল ২৭৷৷৷। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮০২ সনে। বইয়ের শেষে ২৭৫ জন খুচরো গ্রাহকের তালিকায় জনা তিনেক বাঙালী খদ্দেরের নাম দেখে অতএব বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। সন্দেহ কী, তিন জনই অর্থশালী ব্যক্তি। ১৮১৫ সনে উইলসন-অনূদিত মেঘদূত বিক্রি হচ্ছিল ১৬ সিক্কা টাকায়। লঙ সাহেবের চৌদ্দ শ' বইয়ের তালিকায় দেখছিলাম ১৮২৮ সনে ছাপা মরটন-এর অভিধানের দাম—ছয় টাকা, আর ১৮৩৩ সনে ছাপা হটনের বাংলা-ইংরাজী অভিধানের দাম—আশী টাকা। আরও কিছু কিছু বইয়ের দাম ওই তালিকায় আছে। কয়েকটি বইয়ের দামের কথা উল্লেখ করেছেন দীনেশচন্দ্র সেন মশাইও।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বইয়ের দাম কেমন ছিল লঙ তার একটা তালিকা দিয়েছেন ১৮৫৯ সনে প্রকাশিত তাঁর রচিত আর একটি গ্রন্থ বিবরণীতে।

১৮০২ — বত্রিশ সিংহাসন — ৬৲
১৮০২ — লিপিমালা — ৬৲
১৮০২ — দাউদের গীত — ৬৷৴২
১৮০২ — রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র — ৫৲
১৮০২ — রামায়ণ ৫খন্ড — ২৪৲
১৮০২ — মহাভারত ৪খন্ড — ৮৲
১৮০২ — হিতোপদেশ — ৮৲
১৮০২ — কেরীর বাংলা ব্যাকরণ — ৪৲
১৮০২ — কথোপকথন — ৮৲
১৮০২ — ফরস্টারের অভিধান, ২য় ভাগ, ৩খন্ড—৫৫৲
১৮০৫ — মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম — ৪৲
১৮০৫ — তোতা ইতিহাস — ৬৲

ইত্যাদি।

সম্পূর্ণ তালিকাটি উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই। কারণ সজনীকান্ত দাস তাঁর বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে সেটি উদ্ধৃত করেছেন। আমরা আরও কয়েকখানা বইয়ের দাম উল্লেখ করলেই সেকালের বইবাজারের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। তা ছাড়া বাংলা বইয়ের দর-দাম যে কেমন হত সে খবর সমাচার দর্পণে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনগুলো থেকেও জানা যায়। সুতরাং, উৎসাহী পাঠকের সামনে অনেক সূত্রই রয়েছে।

লঙ-এর তালিকা থেকে আরও জানা যাচ্ছে ১৮২৫ সনে কেরীর বাংলা অভিধান (২ভাগ, ৩খন্ড) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন্য কেনা হয়েছিল ১০০৲ টাকা করে, ১৮২৯ সনে মার্সম্যানের অভিধানের জন্য (২ খন্ড) দাম দেওয়া হয়েছিল ২৪৲ টাকা, ১৮৩৪ সনে রামকমল সেনের অভিধানের (২ খন্ড) দাম—৫০৲ টাকা, ১৮৪৬ সনে বাংলার ইতিহাসের দাম—২৲ টাকা, ১৮৪৭ সনে অন্নদামঙ্গল (২ খন্ড) কেনা হয়েছে ৬৲ টাকা দরে, একই বছরে শ্যামাচরণের ব্যাকরণের দাম ছিল—১০৲ টাকা, আর ১৮৫২ সনে কুসুমাবলী কাব্যের দাম—২৲ টাকা। এই দামেই সরকার

বাহাদুর বইগুলো কিনেছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন্য। শ্রীরামপুর প্রেসের বইয়ের মূল্য তালিকা একাধিকবার "সমাচার দর্পণে"ও ছাপা হয়েছে।

লঙ সাহেব প্যারিস-প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত বাংলা বইয়ের আর একটি তালিকা প্রকাশ করেছিলেন ১৮৬৭ সনে। তাতেও অধিকাংশ বইয়ের দাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই তালিকাটি শ্রীমহাদেবপ্রসাদ সাহা কিছুকাল আগে (১৯৬৫) পুনর্মুদ্রিত করেছেন। সেটি প্রকাশিত হয়েছিল—ঢাকার সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যায় (১৩৭১)।

বটতলার বই সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা বলেছিলাম বটতলার এক বিশেষ অবদান সস্তা দরে বই। বইয়ের দাম ও'রা কী পরিমাণে কমিয়ে ফেলেছিলেন তার একটা তুলনামূলক আলোচনা করেছেন সুকুমার সেন। তিনি লিখেছেন—"বটতলা-ছাপাখানার দৌলতে বাংলা বইয়ের দাম অসম্ভাবিত রকমে কমিয়া গিয়াছিল পঁচিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে। কৃত্তিবাসের সম্পূর্ণ কাব্যের শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছাপা সংস্করণের মূল্য ছিল চব্বিশ টাকা, এংলো ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা (১৮৫৬) সংস্করণের (কোয়ার্টো ৪৯৪ পৃষ্ঠা) দাম মাত্র দেড় টাকা। কৃত্তিবাসের আদিপর্ব রামকৃষ্ণ মল্লিকের প্রেসে ছাপা (১৮৩) তিন টাকা, সুধাসিন্ধু প্রেসে ছাপা (১৮৫৬) দুই আনা মাত্র। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল বিশ্বনাথ দেবের প্রেসে ছাপা (১৮২৩) ছয় টাকা, কমলালয় প্রেসে ছাপা (১৮৫৬) এক টাকা। কালিদাস কবিরাজের বেতাল পঞ্চবিংশতি সমাচার চন্দ্রিকা প্রেসে ছাপা (১৮৩১) দুই টাকা, সুধাসিন্ধু যন্ত্রে (১৮৫৬) ছাপা চারি আনা। আদিরস মথুরানাথ মিত্রের প্রেসে ছাপা (১৮৩১) চারি আনা, এংলো ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা এক পয়সা মাত্র। ১২৩৮ সালের নূতন পঞ্জিকার মূল্য এক টাকা, ১২৬৩ সালের নূতন পঞ্জিকার (৮০ পৃষ্ঠা) দাম ছয় পয়সা (এংলো ইণ্ডিয়ান প্রেস) ও এক আনা (হরিহর যন্ত্র)। মনে রাখিতে হইবে যে বটতলার বই সর্বদা মুদ্রিত মূল্যের কমে বিক্রয় হইত।"

বইয়ের দাম অনেক সময় হিসাব করা হত ফর্মা বা পৃষ্ঠায়। যেমন, ১৮১৯ সনে ফেলিক্স কেরীর "বিদ্যালহরী"র বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল—"ঐ গ্রন্থের মধ্যে আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দ্দ একাকার কাগজেতে এবং অক্ষরেতে মাসে ২ ছাপা হইবেক। ঐ আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন

ফর্দেতে এক নম্বর দেওয়া যাইবেক ঐ এক ২ নম্বরের মূল্য ২ টাকা।"
১৮৫৯ সনে লঙ বাংলা বইয়ের দাম প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"The new Bengali works Published by Natives, are generally rather high priced when they are copy-wright, as various natives now find the composing of Bengali books profitable, and some authors draw a regular income from them. This is a good sign, as the labour is worthy of his hire, still small profits and quick return have been found by Chambers, Cassel and others, the most lucrative method in the long run. Books for the masses, not copy-wright are very cheap. We have before us a copy of a Bengali Almanac, on good paper of 302 pp. in 8Vo, printed at 60 pages for the anna, while some Almanacs on inferior paper are sold at 80 pages for the anna, This Almanac sells at the rate of 6,000 copies annually."

তিনি জানাচ্ছেন—"শিশুবোধ" বিক্রি হচ্ছে প্রতি ৬০ পৃষ্ঠা এক আনা দরে। বাজে কাগজে ছাপা "বিদ্যাসুন্দর" আগে (১৮২৫) যেখানে বিক্রি হতো এক টাকায় তখন পাওয়া যাচ্ছে দু' আনায়।

লক্ষণীয়, লেখকেরা ক্রমে ক্রমে নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে সতর্ক হয়ে উঠছেন। তাঁরা আর নগদের লোভে গ্রন্থস্বত্ব ছেড়ে দিতে রাজি হচ্ছেন না। বাংলা বই ছাপার কলের মুখ দর্শনের একশ বছরের মধ্যেই বাংলা-দেশে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছেন এক নতুন সম্প্রদায়। তাঁরা লেখক। লঙ সাহেব ১৮৫৫ সনে ৫১৫ জন লেখকের এক তালিকা তৈরি করেছিলেন। ১৮৫৯ সনে তিনি লিখেছেন—

"That the Bengali mind has been roused from the torpor of ages, is pretty clear from the increase of the number of Bengali Authors. I have before me a list of them which I have drawn up, and which gives the names of more than 700, and at the present time there is a great ambition to be writer in his own language. The supply is equal to

the demand and were there a larger reading population, authors would multiply still more rapidly."

লেখক হওয়ার জন্য এই ব্যাকুলতা শুধু পাঠকের তাড়নায় নয়, সম্ভবত মনের কথা পাঁচজনকে খুলে বলার বাসনায়ও। ছাপাখানা যে স্বর্ণযুগের দুয়ার খুলে দিয়েছে সামনে, সামাজিক মানুষ তার সুযোগ নিতে চাইবেন এটাই স্বাভবিক। ও'রা সাধ্যমত নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধি, সুখ-দুঃখ, অনুভব-অনুভূতি এবং ভাব-ভাবনা অন্যের মনে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করছিলেন মাত্র।

• দ্রষ্টব্য : **সংবাদপত্রে সেকালের কথা,** (২ খণ্ড), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৫৬ ; **বটতলার বেসাতি**—সুকুমার সেন, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫৫ ; **বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস**—সজনীকান্ত দাস, পরিবর্তিত সংস্করণ, ১৩৬৯ ; *Selection from Calcutta Gazettes,* (Vol I & II)—W. S. Seton-Karr, 1864 ; *A Descriptive Catalogue of Bengali Works, 1400 Bengali Books and Pamphlets* . . . . . etc—Rev. J. Long, 1855 ; *A Return of the names and writings of 515 persons, connected with Bengali Literature*—Rev. J. Long, 1855 ; *Publications in the Bengali Language in 1857*, (Selections from the Records of the Government published by Authority, No.—XXXII)—Rev. J. Long, 1859 ; *Descriptive Catalogue of Vernacular Books and Pamphlets forwarded by the Govt. of India to Paris Universal Exhibition of 1867*,—Rev. J. Long.

৬৪। বই কি কেবল সাজিয়ে রাখার জন্য? গ্রামের আগন্তুকের এই প্রশ্নের উত্তরে নাগরিক বাবু কিন্তু চুপ করে থাকেননি। তিনি বলেন—"পুস্তক প্রস্তুত করিবার কারণ বুঝিতে পারো নাই, অতএব নানা তর্ক করিতেছ, পুস্তক সংগ্রহের কারণ এই ভাগ্যবান লোকের সংসারে তাবৎ দ্রব্যই থাকে তাবৎ রত্ন যত্ন করিয়া রাখেন কিন্তু সর্বদা সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়না যখন যাহার আবশ্যক হয় তখনি তাহা ব্যবহার করেন যাঁহার দিগের সকল পুস্তক ব্যবহার করিবার কোন প্রয়োজন রাখেনা

তাঁহারা কি এমত দায়গ্রস্ত হইয়াছেন যে ঐ কেতাবগুলিন অর্থ ব্যয় করিয়া কিনিয়াছেন তাহা ব্যবহার [না] করিলে দিন যাপন হয়না এমত নহে আর যাহারদিগের কেতাব ব্যবহার না করিলে দিন চলেনা তাঁহারা তাহা করিয়াও থাকেন এখন বুঝিলা কেমন মনের মত উত্তর হইয়াছে।"

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদিযুগের অন্যতম বাঙালী লেখক এবং প্রকাশক। **কলিকাতা কমলালয়** বইখানি প্রকাশিত হয় ১২৩০ বঙ্গাব্দে। তাতে নানা প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। পুস্তক-প্রসঙ্গও বাদ পড়েনি।

দ্রষ্টব্য : **কলিকাতা কমলালয়**—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা-১, ১৩৪৩।

৬৫। রামমোহনের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—"মার্সম্যান সাহেব পুনর্বার আক্রমণ করিলেন। রামমোহন রায় দ্বিতীয়বার আপনার নাম দিয়া *Second Appeal to the Christian Public* প্রকাশ করিলেন। মার্সম্যান সাহেব সহজে নিরস্ত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি আবার উত্তর করিলেন। রামমোহন রায়ও তাঁহার তৃতীয় উত্তর পুস্তক প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু একটি ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। এতদিন পর্যন্ত রামমোহন রায়ের গ্রন্থ ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত হইত। এক্ষণে মুদ্রাযন্ত্রাধ্যক্ষ তাঁহার পুস্তক খ্রীষ্টধর্মবিরোধী জ্ঞানে মুদ্রিত করিতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু রামমোহন রায় প্রতিবন্ধক দেখিয়া নিবৃত্ত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি অক্ষরাদি প্রস্তুত করাইয়া নিজে ধর্মতলায় 'ইউনিটেরিয়ান্ প্রেস' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্রালয় স্থাপন করিলেন। উহার কার্য প্রায়ই দেশীয় লোকের দ্বারা সম্পন্ন হইত। এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, রামমোহন রায়ই দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম সংস্থাপক। ১৭৪৫ শকে, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে, এখান হইতে *Final Appeal* নাম দিয়া তাঁহার নিজের নামে তৃতীয় উত্তর পুস্তক বাহির হইল।"

এ-দেশে মুদ্রাযন্ত্রের সমাজতত্ত্ব চর্চায় এ-ঘটনার তাৎপর্য নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। কিন্তু এতে দুটি তথ্যগত ভুল রয়ে গেছে। এক—ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে রামমোহনের আগেকার সব বই ছাপা হয়নি। রামমোহন রায় লিখিত গ্রন্থতালিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তাঁর বই নানা সময়ে নানা ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়েছে। ফেরিস কোম্পানি,

সংস্কৃত প্রেস, স্কুল বুক সোসাইটির প্রেস, ইত্যাদি হরেক ছাপাখানার নাম রয়েছে মুদ্রাকরের তালিকায়। দ্বিতীয়ত, ইউনিটারিয়ান প্রেস দেশীয় লোক প্রতিষ্ঠিত এদেশের প্রথম ছাপাখানা নয়। দেশীয় লোকেদের প্রথম ছাপাখানার প্রতিষ্ঠাতা, আমরা আগেই জেনেছি, বাবুরাম এবং গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। তবে সবাই জানেন, রামমোহন রায়ের সঙ্গে ছাপাখানার সম্পর্ক আরও ব্যাপক এবং তাৎপর্যে আরও দূরপ্রসারী। রামমোহন যুগপুরুষ। এক হাতে যদি তিনি ধর্মীয় তর্কযুদ্ধ চালাচ্ছেন বই লিখে, অন্য হাতে তবে পরিচালনা করছেন সংবাদপত্র। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার পক্ষেও তিনি অসমসাহসী যোদ্ধা।

দ্রষ্টব্য : **মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত**—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নতুন সংস্করণ, ১৩৭৯ ; **রামমোহন রায়**—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৫৩।

৬৬। বিদ্যাসাগরের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"১৮৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত কলেজে চাকরি করিতেন, সেই সময়ে উভয়ে সংস্কৃতযন্ত্র নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। আপনাদের রচিত গ্রন্থ ঐ যন্ত্রে মুদ্রিত হইবে, আপনাদের পছন্দমতো পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে ইহাই তাঁহাদের যন্ত্র স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।" প্রেসটি কিনেছিলেন ওঁরা ৬০০ টাকা ধার করে। সময়ে ধার পরিশোধ না করতে পেরে বিদ্যাসাগর মশাই যখন চিন্তিত তখন মার্সাল সাহেব পরামর্শ দিয়েছিলেন—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের জন্য যদি সুন্দর করে "অন্নদামঙ্গল" ছেপে নিতে পার তবে ধার মেটাবার ব্যবস্থা করে দেব। বিদ্যাসাগর এই পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রকাশিত "অন্নদামঙ্গল" একশ' কপি কিনেছিলেন। ঋণ থেকে মুক্তি পেয়ে ছাপাখানা উন্নতির পথে পা বাড়াল। তারপর নানা কাণ্ড। তর্কালঙ্কারের সঙ্গে বিরোধ ইত্যাদি। সে-সব কাহিনী বিদ্যাসাগর মশাই নিজেই লিখে রেখে গেছেন। আমাদের পক্ষে তার চেয়েও জরুরী খবর, বিদ্যাসাগর মশাই শুধু ছাপাখানা আর বইয়ের দোকান প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হননি, মুদ্রণশিল্পের উন্নতির সঙ্গেও নানাভাবে জড়িয়ে আছে তাঁর নাম। স্কুলের ছেলেমেয়েদের পাঠ্য বইয়ে ব্যবহৃত হরফের

মান স্থির করার জন্য তাঁর চেষ্টার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি নাকি সেজন্য শ্রীরামপুরের একটি ঢালাই কারখানায় পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিলেন। বিহারীলাল সরকার তাঁর বিদ্যাসাগর-জীবনীতে লিখেছেন —কম্পোজিটারের সুবিধার কথা ভেবে বিদ্যাসাগর মশাই খোপে খোপে অক্ষর সাজিয়েছিলেন নতুনভাবে। তাকে বলা হয়—"বিদ্যাসাগর সার্ট"। বিনয় ঘোষ তাঁর বিদ্যাসাগর-চরিতে কলকাতার খ্রীশ্চিয়ান এডুকেশন সোসাইটির জন মারডক-এর লেখা একটি দীর্ঘ চিঠি উদ্ধৃত করেছেন। চিঠিটি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লেখা। চিঠির তারিখ—২২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬। বিষয়—বাংলা মুদ্রণ। বাংলা ভাষায় বইপত্র ছাপতে গিয়ে কী কী সমস্যা হচ্ছে, সংস্কারের প্রয়োজন কেন, সুযোগই বা কোথায় তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কাছে তিনি আবেদন করেছেন একটা বিহিত করার জন্য। বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই উত্তর দিয়েছিলেন। সেটা অবশ্য পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেলে বাংলা হরফের সংস্কারের জন্য তিনি কী ভাবছিলেন তাও আমরা জানতে পারতাম।

দ্রষ্টব্য : **বিদ্যাসাগর**—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নতুন সংস্করণ, ১৩৭৬ ; **নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস**—ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা, (গোপাল হালদার সম্পাদিত **বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ**, ৩য় খণ্ড, ১৯৭২) ; **বিদ্যাসাগর**—বিহারীলাল সরকার ; **বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ**—বিনয় ঘোষ, প্রথম ভাগ, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৭১।

৬৭। "বিদ্যাসাগরের সহযোগীদের বন্ধুদের মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ছাড়াও আরও অনেকে ছাপাখানার কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল) ও পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য," লিখেছেন বিনয় ঘোষ। তাঁর মন্তব্য—"ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে দেখা যায়, বাংলার নবজাগরণের আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, ছাপাখানাও তাঁদের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল।...ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগৃতি সংগ্রামকে তাই মুদ্রিত পত্রপত্রিকা ও পুস্তক পুস্তিকার সংগ্রাম বলা যায়।"

লেখার পর বই ছাপানোর সমস্যায় পড়তে হয়েছে সেকালের অনেক বিখ্যাত লেখককেই। এমনকি মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথও বাদ

নেই। প্রধান সমস্যা অর্থের, দ্বিতীয় মনের মতো ছাপার। সৌভাগ্য, মাইকেল কয়েকজন এমন গুণগ্রাহী পেয়েছিলেন যাঁদের শুধু রসবোধ ছিল না, অর্থও ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত নিজেই কাঁঠালপাড়ায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—বঙ্গদর্শন যন্ত্র। আর রবীন্দ্রনাথ? মুদ্রাকরের হাতে তাঁর লাঞ্ছনার করুণ কাহিনী সকলের জানা। বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের সূচনা ১৯২৩ সনের জুলাই মাসে। তার আগে নিজের বই ছাপাবার জন্য তাঁকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়েছে হয় অনুরাগী বন্ধুজন, না-হয় উদাসীন প্রকাশকের ওপর। "আমার প্রতি নিতান্ত নিঃসম্পর্ক লোকের মত ব্যবহার করা হচ্ছে—কোনো খবরও পাইনে, আশাও পাইনে, প্রুফও পাইনে"—অসহায়ের মতো কবির এ অভিযোগ তাঁর এক প্রকাশক সম্পর্কে। তাঁর সখেদ উক্তি—"কোনো দেশের কোনো প্রকাশক গ্রন্থকারের প্রতি এরকম নিষ্ঠুর আইন চালায়নি।" তাও রবীন্দ্রনাথ যখন নিয়মিত, পেশাদার প্রকাশকের সন্ধান পেয়েছেন তখন বয়স তাঁর চল্লিশ উত্তীর্ণ। প্রকাশক পাওয়ার পরেও বেশ কিছু বই ছাপাতে হয়েছে তাঁকে নিজের পয়সায়, নামপত্রে তথাকথিত প্রকাশক মশাই নিজ প্রতিষ্ঠানের নামটি বসিয়ে দিয়ে বইয়ের শোভাবর্ধন করতেন এই যা। এ সম্পর্কে একটি তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন পুলিনবিহারী সেন। বাংলা প্রকাশন শিল্পের ইতিহাস এবং বাংলা সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব আলোচনায় ওই সব তথ্যের মূল্য অনেক। "পাবে গুরুদাসের নিকট ওজনদরে সস্তা"—এই নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের লক্ষ্যও কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বই।

দ্রষ্টব্য : **জনসভার সাহিত্য**—বিনয় ঘোষ, ১৩৬২ ; **রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশ**—পুলিনবিহারী সেন, আনন্দবাজার পত্রিকা, রবীন্দ্র শতবর্ষ পূর্তি ক্রোড়পত্র, ১৯৬১ ; **গ্রন্থনবিভাগ, বিশ্বভারতী**, পঞ্চাশৎবর্ষ পরিক্রমা, ১৯৭৪।

৬৮। **সমাচার দর্পণ** এবং **বঙ্গদূতের** উদ্ধৃতিগুলো ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত **সংবাদপত্রে সেকালের কথা** (১ম খণ্ড) থেকে নেওয়া।

৬৯। উনিশ শতকের বাংলা সংবাদপত্র এবং সমসাময়িক পত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য : **বাংলা সাময়িকপত্র**, (২খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মুদ্রণশিল্পের আলোচনায় সংবাদপত্রের শিরোনাম, পত্রবিন্যাস, রকমারি হরফের ব্যবহার সবই গুরুতর। সংবাদপত্রের বেশ কয়েকটি

উল্লেখযোগ্য ইতিহাস লেখা হয়েছে বটে, কিন্তু ছাপাখানার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের অঙ্গসজ্জায় যে পরিবর্তন ঘটেছে তা নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়েছে বলে মনে হয় না। আমরাও সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রে ব্যবহৃত কাঠের ব্লকের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেই দাঁড়ি টানতে বাধ্য হয়েছি। কেননা, বিষয়টি বিপুল এবং জটিল,—স্বতন্ত্রভাবে গবেষণার যোগ্য। ফলে বাংলা প্রকাশন শিল্পের মতোই সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রের প্রসঙ্গ এই আলোচনায় খুবই সীমাবদ্ধ রয়ে গেল।

৭০। ১৮৮৫-৮৬ সনের এই হিসাবটি প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার "স্টেটস্‌ম্যান" কাগজে। তাতে বাংলায় ছাপার কলের সংখ্যা বলা হয়েছে ২২৯টি। তার মধ্যে দেশীয় লোকেদের পরিচালিত কয়টি উল্লেখ নেই। ১৮৫৯ সনে লঙ সাহেব যে তালিকা প্রকাশ করেন তাতে দেখা যায় শুধু কলকাতায় বাংলা বই কিংবা পত্রিকা ছাপার জন্য ছাপাখানা রয়েছে ৪৬টি। তার মধ্যে আছে আলিপুরের জেলের ছাপাখানা (প্রতিষ্ঠা—১৮৫৬), অ্যাঙ্গলোইণ্ডিয়া, ইউনিয়ন, অনুবাদ প্রেস, ভাস্কর, বাঙ্গালা যন্ত্র, বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা, ব্যাপটিস্ট মিশন, বেঙ্গল সুপিরিয়র, বিশপস কলেজ, ভুবনমোহন প্রেস, বিশ্বপ্রকাশ, চৈতন্য চন্দ্রোদয়, চন্দ্রিকা, কোনস, হরিহর, হিন্দু প্যাট্রিয়ট, জ্ঞানোদয়, জ্ঞান রত্নাকর, কবিতা রত্নাকর, কমলালয়, কাদেরিয়া, লক্ষ্মীবিলাস, নিউ প্রেস, নিস্তারিণী, নিত্যধর্মানু-রঞ্জিকা, প্রভাকর, পূর্ণচন্দ্রোদয়, রহমানী, রায় প্রেস, রয়াল ফিনিক্স, রোজারিও, সংস্কৃত যন্ত্র, সর্বার্থ প্রকাশিকা, সত্যার্ণব, শাস্ত্রপ্রকাশ, স্ট্যান-হোপ, সুচারু, সুধাবর্ষণ, সুধানিধি, সুধার্ণব, সুধাসিন্ধু, তত্ত্ববোধিনী, বিদ্যারত্ন যন্ত্র—ইত্যাদি।

লঙ প্রত্যেকটি ছাপাখানার ঠিকানা দিয়েছেন, এবং কয়েকটির প্রতিষ্ঠা বছরও উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন—কাঠের ছাপাখানা আজ আর দেখাই যায় না,—"and a wooden press is a curiosity." কৌতূহলী গবেষক খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন তাঁর তালিকার কয়টি ছাপাখানা আজ জীবিত। তাঁর ওই বিবরণে হুগলি শ্রীরামপুরের কথাও আছে। শ্রীরামপুর সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ১৭৯৩ সন থেকেই ছাপাখানার অস্তিত্ব ছিল সেখানে। আমরা আলোচনা করে দেখিয়েছি তার কোনও নিশ্চিত প্রমাণ নেই। "সিক্ষ্যাগুরু" যে শ্রীরামপুরেই ছাপা তা জোর করে

বলা যায় না। লঙ-এর বিবরণ অনুযায়ী ১৮৫৭ সনে শ্রীরামপুরে ছাপাখানা বলতে তমোহর প্রেস, বিদ্যাদায়িনী প্রেস, ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া প্রেস, আর চন্দ্রোদয় প্রেস। তমোহর প্রেস সে-বছর বই ছেপেছিল এগারোখানা, বিদ্যাদায়িনী যন্ত্রে ছাপা হয় বারোখানা আর চন্দ্রোদয় যন্ত্রে—মাত্র তিনখানা। তাজ্জব ব্যাপার, এই তমোহর প্রেস সম্পর্কে কিন্তু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ক্যাথারিন ডিল। তিনি লিখেছেন—এ ছাপাখানাটির রহস্য কী, কেউ জানে না। ১৮৫৬ সনে এই ছাপাখানায় ছাপা কেরীর অভিধানের একটি খণ্ড দেখে তিনি বলেছেন ওঁদের মুদ্রণ-চিহ্নাদি বলছে এটি যেন মিশন প্রেসের চৌহদ্দির মধ্যেই রয়েছে। লঙ-এর দেওয়া তালিকাটি দেখলে তিনি বোধহয় এ-ভুল করতেন না। তবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই, "তমোহর" এবং "চন্দ্রোদয়"এর অস্তিত্ব সত্ত্বেও শতাব্দীর মধ্যাহ্নে পৌঁছে শ্রীরামপুরের গৌরব-সূর্য অস্তমিতপ্রায়। হুগলির খবর আরও হৃদয়বিদারক। একদিন যেখানে ছাপাখানার সঙ্গে বাংলা অক্ষরের প্রথম পরিচয় সেই হুগলি সম্পর্কে ১৮৫৯ সনে লঙ সাহেব জানাচ্ছেন—মাঝে-মধ্যে এক আধখানা বই ছাপা হয় সেখানে!

দ্রষ্টব্য : *The Statesman, An Anthology*, (1875—1975), Compiled by—Niranjan Majumder, 1975 ; *Publications in the Bengali Language in 1857*,—Rev. J. Long, 1859.
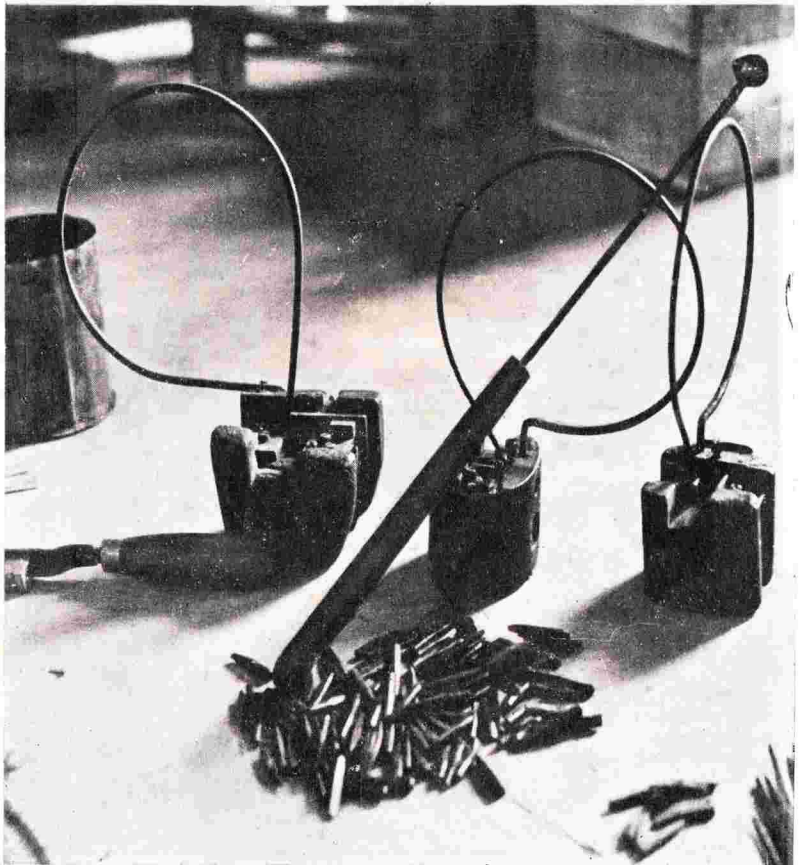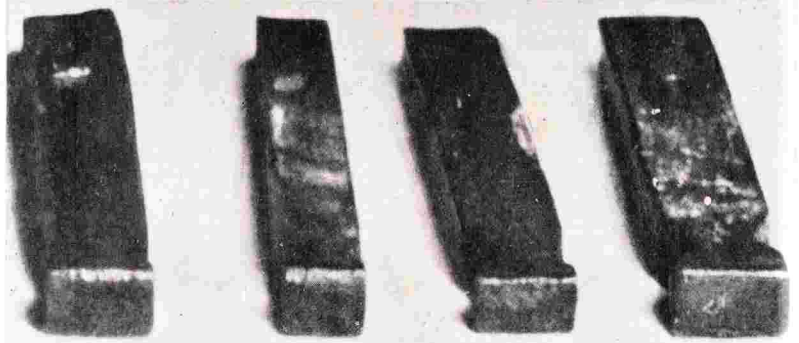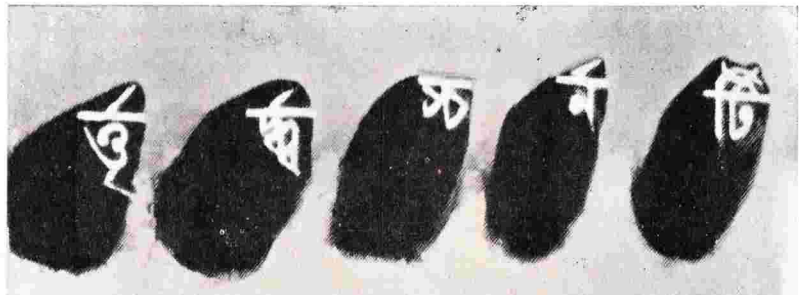
Prelū Ascēsianū
I B

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ

ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ

ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন

প ফ ব ভ ম য র ল ব

স ষ শ হ ক্ষ

ক কা কি কী কু কূ

কে কৈ কো কৌ কং কঃ

	Shanferit.	Bengaly.	Nagry.
To Abuse To reproach rudely	अश्लीलीदानं	গালি দেবা	गाली देना
Abuse rude reproach	अश्लीली	গালি	गाली
Accent	स्वर व्यंजन हल	ঝিশা	मंतना
To Accept to receive kindly	स्वीकर्त्तव्यं	লৈবা	मानलेना
Acceptance Reception with approbation	स्वीकार	লৌ	कबूल
Accident Chance	संयोग घटना	সংযোগ	संजोग
Accidental	संजोगं	সংযোগের	संजोगं
Accidentally	अकस्मात् हठा	অকস্মাত	अचानक
To Accompany	सगः कर्त्तव्यः	সঙ্গ সা সাথিয়া	साथ जाना
Accomplice	द्वौ अपकारनौ	দুই অপকারী	संघाती
Accompt	संख्या गननं	লেখা গনা	लेख्खा
To Accumulate	संचयकर्त्तव्यः	সঞ্চয় করা	जमा करना
Accumulation	संचय एकत्र	সঞ্চয়	जमा
Accusation	अपवादः जनलम्भः	অপবাদ	ठेमा
To Accuse	अपवादोदयः	অপবাদ দেওয়া	ठेसा देना

BENGALLEE.

ঠ	ট	ঞ	ঝ	জ	ছ	চ	ঙ
thŏ	tŏ	iun	zhŏ	zŏ	shŏ	sŏ	uang
ঘ	গ	খ	ক	ভ	ব	ফ	ন
ghŏ	gŏ	khŏ	kŏ	bhŏ	bŏ	phŏ	nŏ
ধ	দ	থ	ত	ণ	ঢ	ড	ক্ষ
dhŏ	dŏ	thŏ	tŏ	anŏ	dhŏ	dŏ	khiŏ

VOWELS.

অ	o	আ	aa	ই	ee	ঈ	ee
উ	oo	ঊ	oo	ঋ	ree	ৠ	ree
ঌ	lee	ৡ	lree	এ	a	ঐ	i
ও	o	ঔ	ou	অং	ung	অঃ	oh

বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী

A GRAMMAR OF THE BENGAL LANGUAGE

BY

NATHANIEL BRASSEY HALHED.

ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নয়যুঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং॥

PRINTED

AT

HOOGLY IN BENGAL

MDCC LXXVIII.

ধ্যান ভাঙ্গি সোমদত্ত দেখিল মহেশ।
বিভূতি ভুসন অঙ্গ জটা তার কেশ॥

আনন্দিত সোমদত্ত দেখিয়া চান্দরে।
বিবিধ পৃকারে রাজা অতি স্তুতি করে॥

সোমদত্ত বলে যদি হইলা কৃপাবান।
এক নিবেদন আমি করি তোর স্থান॥

সভা মধ্যে সেনী মোরে অপমান কৈল।
জতেক ভূপতি গন বসিয়া দেখিল॥

অগ্নিবত অঙ্গে দহে সেই অপমান।
এই নিবেদন আমি করি তোর স্থান॥

যদি মোরে বর দিবা দেব পসুপতি।
মহা ধনুর্দ্ধর হউক আমার সন্ততি॥

তার পুত্রে মোর পুত্র জিনুক সমরে।
রাজা গন মধ্যে জেন অপমান করে॥

ইহা বিনু অন্য বর নাহি চাহি আমি।
এই বর মোরে দেব আজ্ঞা কর তুমি॥

F

হর

" *I ſee* all the Heavens as it were in a cloud of fire,
" The ſtar Dhoomkatoo diſplays its brightneſs in the open day."

সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি স্বর্গ জাই আমি।
এই পাপে ধনঞ্জয় জাবে অধোগামি॥

" Falling in the line of battle I *aſcend* to Paradiſe,
" But thou, O Dnonongjoy, for this crime wilt go to hell."

The form for the participle preſent is the ſame with that of the firſt perſon of this preſent tenſe; as দেখি *ſeeing* or I *ſee*, আসি *coming* or I *come*; as

কুরুবীর ভঙ্গ দেখি দ্রোণের নন্দন।
অর্জুন সম্মুখে আসি দিল দরশন॥

" The ſon of Dron *beholding* the flight of the *Kooroos*, *coming* " into the preſence of Orjoon, diſcovered himſelf!"

The firſt gerund or ſupine is formed from this participle, by adding to it the termination of the oblique caſe তে as কান্দিতে *in* or *by weeping*, মরিতে *in dying*, হইতে *in becoming* &c. Example.

কান্দিতে কান্দিতে রানী হইল মূর্চ্ছিত

" *By repeated weeping* the Raanee became ſenſeleſs."

This gerund commonly ſupplies the place and the uſe of our

৭শ্রীরাম——

গরিবনেওআজ শেলামত——

আমার জমিদারি পরগনে কাকজোল——
তাহার দুই গ্রাম দরিয়াশীকিস্তী হইয়াছে——
শেই দুই গ্রাম পয়স্তী হইয়াছে চাকলে একবরপুরের——
শ্রী হরেকৃষ্ণ চৌধুরি আত্ম রায় জবরদস্তী দখল করিয়া——
ভোগ করিতেছে আমি মালগুজারির শরবরাহতে——
মারাপড়িতেছি উম্মেদওয়ার জে শরকার হইতে আমিন——
ও এক চোপদার শরজমিনতে পহুচিয়া তোরফেনকে——
তলব দিয়া লইয়া আদালত করিয়া হকদারের হক দেলায়া——
দেন ইতি শন ১১৮৫ শাল তারিখ——১১ শ্রাবন——

ফিদবি——
জগতবির রায়——

Errata discovered since the Bengal Grammar came to England.

Page. Line.				
29. 16	for.	*hrosookaar.*	read	*hroswookaar.*
37. 2.	—	*Mohaabaarotar*	—	*Mohaabhaarotar.*
39. 1.	—	নাজাহো	—	নাজাই.
—. 14.	—	চাহো	—	চাই.
48. 15.	—	*baahgonee*	—	*baaghorte.*
76. 14.	—	*ſign*	—	*sign.*
77. 12.	—	*Composions*	—	*Compositions.*
— last.	—	*third*	—	*second.*
85. 5.	—	চালায়	—	চালাই.
89. 18.	—	*were.*	—	*is.*
101. 3.	after.	*and*	ſupply	*the.*
102. 7.	for.	*poroshmai*	read.	*porroshmi.*
109. 4.	—	জাবে	—	জাবি.
112. 6&7.	—	*a river of the water of life*	—	*an immortal stream.*
115 last.	—	*by adding*	—	*having.*
123. 19.	—	দেউযার	—	দেইনার.
133. 10.	—	পরাশ্রয়	—	পরায়.
146. 20.	—	*Maciline*	—	*Masculine.*
166. 2.	—	*seventh*	—	*seventeenth.*
—. 4.	—	ঊনবিংশতি	—	ঊনবিংশ
167. 9.	—	*Airthmetic*	—	*Arithmetic.*
184. 17.	—	*Bead-roll*	—	*Rosary.*
197. 12.	after	*I am not able*	ſupply	*for.*
199. 11.	for	*Kyhatrees*	read	*Khyatrees.*
—. 14.		*The first & third words of this line must change places.*		
204. 7.	for	*principal*	read	*principle.*
205. 12.	—	*Suberdiante*	—	*Subordinate.*

REGULATIONS

Examiner's Office, India. House

FOR THE

ADMINISTRATION

OF

JUSTICE,

IN THE

COURTS OF DEWANNEE ADAULUT,

Passed in Council, the 5th July, 1783.

WITH A BENGAL TRANSLATION,

BY JONATHAN DUNCAN.

CALCUTTA:
AT THE HONORABLE COMPANY'S PRESS.
M,DCC,LXXXV.

পারিবো যদ্যপি সাক্ষী সম্ভ্রান্ত লোকের স্ত্রীলোক হয় কিম্বা সামান্য, লোকের স্ত্রীলোক সহর কলিকাতা হইতে পঞ্চাশৎ ক্রোশের পথের দূরে থাকে তবে তাহার দিগের সাক্ষি লইবার কারণ যেমত মপস্বল দেওয়ানি আদালতের জন্যে লেখাগিয়াছে সেই মত সদর দেওয়ানি আদালত হইতে ও তাহার দিগের সাক্ষাৎ নাআনিয়া প্রাচীনা বিশ্বস্তা স্ত্রীলোক দ্বারা ও সেই স্থানের ব্যবস্থাপক সাহেবের নামে আজ্ঞা পত্র যে মত পূর্ব্বে লেখাগিয়াছে তদনুরূপ লিখিয়া তাহার দিগের দ্বারা সাক্ষি পত্র আনাইবেন ——————————————————

৮১ একাশীতি ধারা

সদর দেওয়ানি আদালতে যদি কোন সাক্ষী আজ্ঞা মতে সাক্ষাৎ নাআইসে অথবা সাক্ষাৎ আসিয়া সূকৃতি নাকরে কিম্বা সাক্ষি পত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিতে নাচাহে কিম্বা আপন অভিপ্রায় মতে অথবা কিছু গ্রহণ করিয়া মিথ্যা সাক্ষি দেয় কিম্বা কচহরির মধ্যে আদালতের অসম্মান করে তবে তাহার সমূচিত জন্যে পূর্ব্বে মপস্বল আদালতের ব্যবস্থাপক সাহেবের দিগের যে মত অধিকার লেখাগিয়াছে সদর দেওয়ানি আদালত হইতে ও সেই মত সমূচিত হবেক ——

৮২ দ্ব্যশীতি ধারা

সদর দেওয়ানি আদালতে যে কেহ মপস্বল আদালতের ডিক্রির পর আপিল করে আপিল করিলে পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে যদি আপন বিষয়ের চলন নাকরায় কিম্বা চলন নাকরাইবার বিশ্বস্ত হেতু নাদর্শায় তবে তাহার বিষয় ডিসমিস হবেক এবং সদর দেওয়ানি আদালতে

যদি

হইয়া ঐ চতুর্থ ধারার লিখিত সকল হুকুম তাহার দিগের প্রতিও চলন ও জারী হইবেক ৷——

৩ তৃতীয় এইযে ৷ যেভূমি অংশীদিগের সহিত সাধারণথাকে কিম্বা উত্তর কালে সাধারণহয সেভূমি যদি সরকারের খাসতহসিলে অথবা ইজারদারের ইজারারহে তবে এমতে সেভূমি তাহার অংশী দিগের সহিত অংশহইলে সেসকল অংশীর গতিক ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত লোক দিগের গতিকের ন্যায হইবেক ও তাহার দিগের ভূমির যে মোকররী জমা দশসনী বন্দোবস্তের আইনেরমতে তলব হইয়াথাকে সেজমা তাহারা কবুল নাকরণ প্রযুক্তেও সেভূমি সরকারের খাসতহসীলে কিম্বা ইজার দারের ইজারায থাকন অভিপ্রায হইয়া ঐ ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত সকল হুকুম তাহার দিগের প্রতিও চলন ও জারীহইবেক ইতি——

তামাম——

A True Translation,
H. P. Forster.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১ প্রথম আইন

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ্চে যে যে বিশেষ বিষয় এস্তেহার নামা ক্রমে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা শ্রীযুত গবরনর জেনেরেল বাহাদুর কওনসেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ মে মোতাবেক বাঙ্গালা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৩ বৈশাখ মোতাবেক বিলায়েতী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বত ১৮৫০ সালের ৩ বৈশাখ মোতাবেক হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানের আইনের মতে নির্দ্দিষ্টিয়া জারী করিলেন ।

শ্রীযুত গবরনর জেনেরেল বাহাদুর কওনসেলের হজুর হইতে সুবে বাঙ্গালা ও সুবে বেহার ও সুবে উড়িষ্যার মোতালক বর সন্নিকীপ যাবত ভূমির স্থির রাজস্ব অর্থাৎ মোকররী জমার বার্য্যযুক্তে যেযে বিশেষ বিষয় সমস্ত জমীদার ও তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারী দিগের কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ্চের এস্তেহার নামাক্রমে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা

সেই

কাজি	a judge
কাজিয়া	quarrel, diſpute
কাজিয়াদার	quarrelſome
কাঁজি	ſour water, canjee
কাস	cough
কাসিতে	to cough
কাসিদ	the poſt dawk
কাস্তো	a crooked knife to cut graſs
কাষ্ঠ	wood
কাঁদর পিল্যা	a ſwelling of the belly [proceeding from an ill cured fever
কাসোর	a round plate of braſs
কাঁসা	braſs
কাঁসার	brazen, of braſs
কাঁসারি	a copper-ſmith
কাঙলা	corrupt blood
কে	who?
কেবা	who?

C 2

English	Bengali
child	জাওয়াল
cold	সিতল
calf	বাচুৰ
to call	ডাকন
cell	ভাঁড়ালি
calm	নিঝুম
colt	ঘোড়ারজানা
comb	চিৰনি
camp	লস্কর
clamp	বাতা
to cramp	কোঁকড়ান
cant	ভাসা
to chant	গাওন
cord	সুতালি
clerk	নায়েব
cork	কাক। ছিপি
corn	দানা
to churn	মন্থন
cart	[illegible]কারগাড়ি
cash	রোক
cask	পিপা
to clasp	বোন-দেওন
class	দফা
cross	তেপতিঙ্গা
cast	জাতি
chest	সিন্দুক
crest	ঝুঁটি
cost	কিম্মত
cloth	বস্ত্র। কাপড়
church	খ্রীষ্ট সাল
to catch	ধৰন
to chide	ডাঁটন
cage	খাঁচা
cake	পিঠা
chime	শব্দ
crime	তক্সির। গুনা
cane	বেত
crane	সারস
cope	তকরার
care	সাবধান
close	কাছে
cue	চক্ষুর-তারা
cave	গর্ত
clove	লবঙ্গ
to change	বদলান
claim	দাওয়া
chain	সিকলি
chair	চৌকি। কেদেরা

College of Fort William 1803

A

VOCABULARY,

IN TWO PARTS,

ENGLISH AND BONGALEE,

AND

VICE VERSA.

BY H. P. FORSTER,

SENIOR MERCHANT ON THE BONGAL ESTABLISHMENT.

VOX ET PRÆTEREA NIHIL.

FROM THE PRESS OF FERRIS AND CO.

1799.

Prayer, অর্চনামন্ত্র orchonamontra স্তব ſtob কবচপাঠ kobochpath.

Preamble, ভূমিকা bhoomika সূত্র ſhootro অনুক্রমনিকা onookromonika.

Precarious, দ্বিধাকল্প dwidhakolpo সন্দেহকল্প ſhondehokolpo অনিস্নাত oniſhnat ঠিকানানাই thikanana-i স্থিরনাই ſthirna-i নৈত্যনাই nytyona-i.

Precaution, উপায় oopay উদ্যোগ oodjog অবধান obodhan মনোযোগ monojog অগ্রসূচনা ogroſhoochona.

Precede, (to) আগেযাওন ageja-on অগ্রেযাওন ogreja-on গত-হ goto-h.

Precedence, অগ্রগন্য ogrogonyo প্রধান prodhan শ্রেষ্ঠ ſhreſhtho.

Precept, আজ্ঞাপত্র ageeanpotro আদেশলিপি adeſhlipi আজ্ঞা ageean নিয়োগ niyog বিধি bidhi.

Precious, বহুমূল্য bohoomoolyo শক্তদর ſhoktodor মহার্ঘ্য moharghyo.

Precipice, আড়রী arree আড়রা arra.

Precipitate, অসাবধান oſhabdhan প্রমাদ promad প্রমত্ত promotto অবিবেচক obibechok অপ্রমিধানী opromidhanee (haſty) উগ্র oogro উষ্মান্বিত ooſhwanito.

Precipitate, (to) ফেলন phelon ফেল্যা-দে phelya-de নিপাতন nipaton নিক্ষেপন nikhyepon (haſten) সত্বরকরান ſhotor-korano. শীঘ্রতরকরান ſheeghrotor-korano.

Preciſe, ঠিক thik সমান ſhoman একীকসমান ekee একসমান ekſhoman তুল্য tooly অবিশেষ obiſheſh.

Preclude, (to) দূর-ক door-k. মিটান mitano ভঞ্জন bhonjon.

Predeceſſor, পূর্ব্বাধিকারী poorbadhikaree পূর্ব্বাধিপতি poorbadhipoti.

Predeſtinarian, ললাটিক lalatiko প্রালব্ধ pralobdhyo.

Predicament, দশা doſha অবস্থা obostha ভাব bhab.

Predict, (to) ভবিষ্যতকথন bhobiſhyot-kothon অগ্রেকহন ogrekohon দিনথাকিতেবোলন dinthakitebolon.

Prediction, ভবিষ্যতকথা bhobiſhyot-kotha হবারকথা hobarkotha আগামীকথা agameekotha ভাবিবাক্য bhabi-bakyo.

Preface, (to) ভূমিকা-ক boomika-k পাতনা-ক patona-k. আড়ম্বর-ক arom-bor-k. আড়ম্বরী-ক aromboree-k.

Prefer, (to) ভালজানন bhalojanon অচ্ছাবুঝন achchaboojhon উৎকৃষ্টজ্ঞান-ক oothkriſhtogeean-k. (exalt) বাড়ান barano চড়ান chorano বৃদ্ধিপাওয়ান briddhipa-oano বর্দ্ধিষ্ণুকরান bord-dhiſhnoo korano (a petition) আদ্দাশ-ক addaſh-k. গোহারী-ক gobaree-k.

Preferable, অতিপ্রশংসনীয় otiproſhong-ſhoneeyo. বড়অনুরাগের baro-onoorager অরোভাল orobhalo অপেক্ষাভাল opekhyabhalo.

NOTICE IS HEREBY GIVEN,

THAT on *Monday, the* 11*th April next, will be Sold at Public Outcry in the New Fort, a quantity of RICE and PADDY; part of the Victualling Stores in the New Fort, belonging to the* Honorable Company,

The Rice and Paddy to be delivered on payment of the money, and if not cleared out within one month from the day of the sale, to be again put up at Outcry, the former purchaser to sustain all loss that may arise thereon. One Sicca Rupee as earnest to be paid at the sale of each L[illegible]

N. B. The Sale to commence at 10 *o'clock, and to be made of Sicca Rupees.*

By Order of the Honorable
The GOVERNOR GENERAL
And COUNCIL.
R. C. PLOWDEN,
Garrison Store Keeper.

Calcutta, March 30, 1785.

এই খবর দিতেছি ১১ আপরিল সোমবার নূতন গড়ে সম্প্রানির গোবিন্দ ইস্টোরের মধ্যে চাল ও ধান্য নিলামে বিক্রী হইবেক —— নগদ টাকা দাখিল করিলে জিনিস ওজন দেয়া জাবেক যে কেহ খরিদ করিবেক বিক্রীর তারিখ ধরিয়া এক মাসের মধ্যে জিনিস খালাষ করিয়া নইবেক এক মাহার মধ্যে টাকা দাখিল করিয়া জিনিস খালাষ নাকরে পুনরায় নিলামে সেই জিনিস বিক্রী হইবেক তাহাতে যে কিছু খেসারত হইবেক প্রথম খরিদ করণ ওয়ালা নিস্তাকরিবেক বায়না ফিস্যাটে সিক্কা এক তঙ্কা খরিদ করণ ওয়ালা দিবেক —— নিলাম ১০ দস ঘড়ির সময় আরম্ভ হইবেক বিক্রীর টাকা সিক্কা রকম খরিদ করণ ওয়ালারা দিবেক ——

হুকুম গবনর জানরেল ও সাহেবান কৌনসল ——

কলিকাতা তারিখ ৩০ মার্চ ১৭৮৫ সাল ——

Messrs. BURGH and BARBER,

TAKE *the liberty of informing their Friends and the Public, that they have agreeably to their Letters of the* 12*th of May last, opened a house in Calcutta, for transacting all kinds of AGENCY and* COMMISSION BUSINESS, *on the usual and customary Terms.—They beg leave to assure their Friends and the Public, that it is their fixed Determination (to which they are legally bound to each other) not to enter into any Mercantile Concern whatever on their own Account, but to confine themselves solely to the Agency and Commission Business.*

For the Advantage of those who may honor them with their Employ, they have determined to extend their Business to Europe, and they have engaged the House of Mess. Robert and Francis Gosling, and Wm. Pepham, Esq. (late Lieut. Col. in the Hon. Company's Service) as their Agents in London.

Mess. Burgh and Barber beg leave to assure those Gentlemen who may favour them with the Management of their Concerns, that they may rely on all their Orders being immediately and punctually complied with.

N. B. Mr. Burgh having quitted his Residence at Moorshedabad, will be much obliged to his particular Correspondents, to direct their Letters in future to him at Calcutta.

REMITTANCE.

MR. BARNET, at BENARES, continues to grant Bills on London, with a collateral security in Rough Diamonds, at 2s. 3d. the current rupee.

Mr. BARNET having experienced great inconveniences from receiving commissions when the Europe ships are on the point of sailing, entreats the favour of three months previous notice given him, to enable him to prepare the Diamonds properly, though payment is not required till the Diamonds are ready to be delivered to the Remitter.—Mr. BARNET having relinquished every other pursuit, means to devote his time and attention to the purchase of Diamonds only.

BLACK VARNISH,

Prepared by POWELL *&* NEWBY, *of* London,*—and now for SALE at the* Agency-Office.

AFTER repeated trials, by order of the Honorable Navy Board, the Commissioners were pleased to direct it should be used for the navy, in lieu of black paint, for masts, yards, and all other parts of the ship heretofore painted with black; also about anchors, and all iron work, being proved an infallible preservative of timber from decay, and iron from rust.—It bears a bright shining gloss, never affected by weather; and the more it is exposed, either to air or water, the more durable it becomes.

This Varnish, both black and yellow, lately imported on the HUSSAR, may be had genuine at the Agency-office.

N. B. It will be found a powerful preserver of beams, and house timbers, and the bottoms of boats and budgerows, against worms and decay, superior to copper.

SEA AND OTHER PROVISIONS,
By A. BERNARD,
Opposite to the AGENCY OFFICE.

WILLIAM HUGGINS,
Late of PATNA,

TAKES this opportunity of returning his grateful acknowledgements to his friends at that place, for the countenance they have shewn him in his business, which he begs leave to inform them he has given up in favour of Mr. JOHN WHEATLY, who he takes the liberty of recommending to their future favour and countenance.

Mr. HUGGINS hopes that those Gentlemen who are indebted to him will make a point of paying without delay, as his short stay in this country will put it out of his power to grant long indulgence.

TO let, a handsome house on the banks of this river, with a hall and four rooms, and offices, within a tide of Calcutta, or two hours drive by land.

Enquire at the Agency Office.

Rent, if taken for 12 months, 120 rupees per month.

B A R K.

FRESH JESUITS BARK in the Quill, just imported from the Brazils, on sale at the Agency-Office, with a variety of other scarce and valuable drugs and medicines, native and of foreign import.

MESS-BEEF and Pork, and sea provisions and stores of all kinds, for sale at the Agency-Office.

For SALE *at the* AGENCY-OFFICE,

Constantly the following Articles, and divers others on commission, too numerous to particularize.

MARINE stores of every kind.
Drugs and medicines, native or imported.
Piece goods, fine napkins.
Towels and sheeting. Shauls.

LIQUORS;

English, Danish, and French Claret.
Old Hock and Red Port.
Madeira and Porter.
Shrub, Brandy, and Arrack.
Real French wine vinegar.
Stoughton's Bitters.
Jar Raisins, Almonds and Dates.
Hartshorne Shavings, Chamomile Flowers
Salep, and Sago.
Chocolate, Hyson Tea, and Mocha Coffee.
Sugar Candy.
Gun Powder, Shot, and Flints.
Chunam, and Sissoo Timber.
Ironmongery, Tools, and Nails.
Fine Terpentine. Also
Stick Lack, and sundry articles suitable for the Europe market.

posed in regular anapæstick verses according to the strictest rules of *Greek* prosody, but in the rhymed couplets, two of which here form a *slóca*.

মূঢ়জহীহিধনাগমতৃষ্ণাং কুরুতনুবুদ্ধেমনঃ সুবিতৃষ্ণাং ।
যল্লভসেনিজকর্ম্মোপাত্তং বিত্তং তেনবিনোদয়চিত্তং ।।

কাতবকান্তাকস্তেপুত্রঃ সংসারোয়মতীববিচিত্রঃ ।
কস্যত্বং বাকুতআয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয়তদিদং ভ্রাতঃ ।।

মাকুরুধনজনযৌবনগর্ব্বং হরতিনিমেষাৎকালঃ সর্ব্বং ।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বাব্রহ্মপদং প্রবিশাশুবিদিত্বা ।।

নলিনীদলগতজলবত্তরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলং ।
ক্ষণমিহসজ্জনসংগতিরেকা ভবতিভবার্ণবতরণেনৌকা ।।

যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননীজঠরেশয়নং ।
ইতিসংসারেস্ফুটতরদোষঃ কথমিহমানবতবসন্তোষঃ ।।

দিনযামিন্যৌসায়ং প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌপুনরায়াতঃ ।
কালঃ ক্রীড়তিগচ্ছত্যায়ুস্তদপিনমুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ।।

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং ।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং তদপিনমুঞ্চত্যাশাভাণ্ডং ।।

মহাভারত

ব্যাসোক্ত ।—

পয়ারাবলি ছন্দে ।

কাশীরাম দাস বিরচিত ।———

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল ।—

১৮০২ ।—

ভুষণ্ডি বলেন আমি সব তাহা জানি
অস্তিকের উপাখ্যান অদ্ভুত কাহিনি।

মহা ভারতের কথা অমৃতের ধার
পুরাণের মুখ ইহা বিনে নাহি আর।
কাশী রাম দাসের প্রণাম সাধু জনে
পাইবা পরম প্রীত যাহার শ্রবণে।

জিজ্ঞাসিল কত তবে জনকের স্থানে
ভুষণ্ডি বলেন শুন অদ্ভুত আখ্যানে।
জটাচার্য্য বংশে জন্ম জরৎকারু মুনি
যোগেতে পরম যোগী ত্রিজগতে জানে।
স্বচ্ছন্দে ভ্রমিয়া গেল দেশ দেশান্তরে
ওলক্ষি উন্মত্ত বেশ সদা অনাহারে।
এক দিন অরণ্যে ভ্রময়ে তপোধন
এক গোটা গর্ত্ত দেখে অদ্ভুত কথন।

তথি মধ্যে দেখয়ে মনুষ্য কত জন
এক গুলা মূল ধরিয়াছে সর্ব্ব জন।
অপূর্ব্ব দেখিয়া জিজ্ঞাসিল জরৎকার
কি কারণে এত দুঃখ তোমা সভাকার।
যে গুলা মূল ধরিয়াছ সর্ব্ব জনে
মূষিক খুদিছে মূল না দেখ নয়নে
এক গোটা মূল মাত্র দৃঢ় আছে তনে?
ক্ষণে ছিণ্ডিবে ইহা ওন্দুর দংশনে
তবেত পড়িবে সাড় গর্ত্তের ভিতর
এত শুনি নিতৃণ করিল উত্তর।

জটাচার্য্য বংশে আমা সভার উৎপত্তি
নির্ব্বংশ হইলাম সেই হইল হেন গতি।
ঋষি বলে কেহ বংশে নাহিক তোমার
বংশে জন্মাইয়া করে সভার উদ্ধার।

বসু নামে গঙ্গা গেল পূর্ব্ব সাগরে
চন্দ্রা নামেতে গঙ্গা গেলেন উত্তরে।
শ্বেতা নামে গঙ্গা গেলেন পশ্চিম সাগরে
পড়িলেন অলকনন্দা পৃথিবী উপরে।
এক ঢেউ মারিলেন ঐরাবতের তরে
নাকে মুখে গেল জল হাঁসফাঁস করে।
আর ঢেউ মেলে তার বেরায় পরাণ
হস্তী বলে গঙ্গা মা কর পরিত্রাণ।
মা বলিয়া হস্তী যদি দাঁতে নিল ধড়
আর ঢেউ তুলে থুইল পর্ব্বত উপর।
পলাইল ঐরাবত পাইয়া ত্রাস
আদি কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

সুমেরু হইতে গঙ্গা লৈয়া ভগীরথে
আসিয়া মিলিল গঙ্গা কৈলাশ পর্ব্বতে।
কৈলাশ হইতে পড়ে পৃথিবী উপরে
তাহার ভরে পৃথিবী টলমল করে।

বেগবতী হৈয়ে গঙ্গা চলিল পাতালে
যে হইতে সাতাইয়ে ভগীরথ বলে।
পাতালেতে হইল তোমার আগমন
আমার বেয়াতে হৈবে বংশের উদ্ধার।
গঙ্গা বলেন বাপু শুন ভগীরথে
পৃথিবী আমার বেগ না পারে সহিতে।
শিব যদি আসিয়া ধরেন জলধার
তবে পৃথিবীতে পারি করিতে অবতার।
গঙ্গার চরণে পুনঃ করিয়ে প্রণতি
আরবার শিব যথা দেব পশুপতি।
এক বৎসর কৈল শিবের আরাধন
শিব বলেন আরবার আইলে কি কারণ।
ভগীরথ বলে গঙ্গা দিল তপস্যাতে
পৃথিবী গঙ্গার ভার না পারে সহিতে।
তুমি যদি মাথায় আসি ধর জলধার
পৃথিবীতে হয় তবে গঙ্গার অবতার।
গৌরীরসহিত তবে নাচে ত্রিলোচন
তোমা হৈতে পাব আজি গঙ্গাদরশন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়স্য চরিত্রং ।

হরিভূমিতে হাবিলি পরগনায়ে কাঁকদি গ্রামে কাশীনাথ রায়মহাশয়ের বসতি ছিল পরগনাও তাঁহার জমিদারি কিছু কাল পরে রাজকরের কারন ঢাকার শুভার সহিত বিবাদ উপস্থিত হইল সেই বিবাদে পরাভব হইয়া বনিতাকে সঙ্গে করিয়া দেশ ত্যাগ করিলেন বহুকাল ভ্রমন করিতেং বাণ্ডয়ান পরগনার বিশ্বনাথ সমাদ্দারের বাটীতে উপস্থিত হইলেন সমাদ্দার যথেষ্ঠ সমাদর করিয়া নিজালয়েতে অপূর্ব্ব স্থান নিরূপন করিয়া দিয়া রায়কে এবং রায়ের গৃহিনীকে যত্নপূর্ব্বক পালন করিতে লাগিলেন কিঞ্চিৎকালা ন্তরে রায়ের বনিতা গর্ব্ভিনী হইয়া রায়কে কহি লেন হে নাথ বুঝি আমার গর্ব্ভ হইল ইহা শুনিয়া রায় অত্যন্ত কাতর হইয়া কহিলেন রাজ্যচ্যুত

মাত্রহইতে সৃষ্টি কখন হইতে পারে না অতএব প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে এ সমস্ত সংসারের সৃষ্টি। কন্যা পণ্ডিতেরদের এই প্রকার বহুবিধ চক্রেতে স্ত্রীস্বভাবপ্রযুক্ত বিড়ম্বিতা হইয়া ঐ বরকে বিবাহ করিলেন। ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং পঞ্চম কুসুমে তৃতীয় স্তবকঃ সমাপ্তঃ।

চতুর্থ স্তবক।

প্রথম কুসুম।

তদনন্তর রাত্রিযোগে বর কন্যাতে একশয্যাতে বসিয়া আছেন ইতিমধ্যে এক উষ্ট্র শব্দ করিল তাহা শুনিয়া কন্যা বরকে জিজ্ঞাসা করিল এ ধ্বনি কে করিল। বর কহিলেন উষ্ট। কন্যা কহিলেন কি আবারতো কও। বর কহিলেন উট্রু কন্যা ইহা শুনিয়া কপালে করাঘাত করিয়া এক শ্লোক পড়িলেন সে শ্লোক এই। কিংন করোতি বিধির্যদি রুষ্টঃ কিংন করোতি সএব হি তুষ্টঃ। উষ্ট্রে লুম্পতি রম্বা ষম্বা তস্মৈ দত্তা বিপুলনিতম্বা। এই শ্লোকের অর্থ বিধি রুষ্ট হইলে কি না করেন তুষ্ট হইলেই বা তিনি কি না করেন ইহার প্রমাণ যে উষ্ট্র শব্দের কখনো রেফের লোপ করে কখনো ষকারের লোপ করে এতাদৃশ বর্ণজ্ঞানরহিত মূর্খেরে আমাকে দেন আর রূপগুণসম্পন্না আমারে তাহাকে দেন। স্ত্রীর এই বাক্য শুনিয়া তৎপতি ঘৃণা ও লজ্জাতে অত্যন্ত বিবেকী হইয়া আপনাকে ধিক্কার করিয়া প্রাণত্যাগার্থে দৃঢ় নিশ্চয়ে ঐ রাত্রে বনপ্রস্থান করিল। বহুল হিংসুজন্তুসমাকুল নিবিড়ান্ধকারে আচ্ছন্ন মহারণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটনকরত কালিদাস পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সমূহপুণ্যপরিপাকে ঐ বনমধ্যে পত্রকুটীরস্থ এক সিদ্ধপুরুষের নিদ্রাবস্থায় মুখহইতে নির্গত নীলসরস্বতীর সিদ্ধমন্ত্র শ্রবণমাত্রে দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া অন্ধকারে না দেখিতে পাইয়া উদ্বন্ধনমৃত রজস্বলা চাণ্ডালীর শবের উপরে উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রস্বা সাধয়েৎ শরীরম্বা পাতয়েৎ ইত্যাকারক দার্ঢ্যপূর্ব্বক নিষ্ঠাকরিয়া মহানিশাতে তন্মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মন্ত্রসিদ্ধির প্রতিবন্ধক বিবিধ বি

আইন

অর্থাৎ

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্‌সেলের
ইং ১৭৯৩ লাং ১৮০১ সালের তাবৎ আইন।

তাহা শ্রীযুত নবাব গবর্নর্ জেনরল বাহাদ্দুর হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাতে
সংশোধিত হইয়া

দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল।

শ্রীরামপুর।

ইং ১৮২৮ সাল। বাং ১২৩৫ সাল।

লোকদিগেরে চাকরি করিয়া তাহারদিগের স্থানে জামিন লইবার কথা।

কালে আদৌ মদিরার ব্যবসায়ী শৌণ্ডিকগণের মধ্যে তৎকর্ম্মোপযুক্ত থাকা লোকদিগেরে চাহর করিয়া তাহারা সারল্যাচরণ করিবারও যথানিয়মে চলিবার নিমিত্তে এবং পাট্টার কটানুসারে কার্য্য করিবার জন্যে তাহারদিগেরে দেনা যাহার যে নিরূপিত টাক্সের এক মাসের টাকার কম না হয় এমত সংখ্যা ধরিয়া তত্তেষের দায়ের নিদর্শনে জামিন এতাদৃশ লোকদিগেরে লইবেন যে তাহারা শুঁড়ী না হয় এবং আপনারদিগের কটানুসারে চলিতে পারে। আর এমত সতর্ক হইবেন যে শুঁড়ীদিগের একে আরের জামিন কদাচ না হইতে পারে ইতি।

২৩ ধারা।

পাট্টা দিবার সংখ্যা নির্ণয়ের মতের কথা।

যথাকার যে চলন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী সন আগামিতে এবং তাহার পর যে সনে যত পাট্টা দিবার আবশ্যক হয় তাহার কারণ কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে জিলা ও শহরসকলের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের সহিত যুক্তি করিয়া সেই যুক্তি সহ হকীকৎ লিখিয়া বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইয়া দেন্ তাহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যে জিলায় ও যে শহরে যত পাট্টা দেওয়া যাইবেক তাহার নির্ণয় করেন্। কিন্তু মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা পোলীসের কার্য্যের প্রতুলজন্যে যত পাট্টা দেওয়া বিহিত জানেন্ তাহার অধিক সে নির্ণয় না হয়। আর মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবদিগের শক্তি আছে যে কোন পাট্টাদার অনুচিত কর্ম্ম করিলে কিম্বা আপন নামের পাট্টার কটের অন্যথাচরিলে তৎকালে তাহার পাট্টার মিয়াদী সন গত না হইয়া থাকিলেও সে পাট্টা ফিরাইয়া লইবার অর্থে হকুম লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা পাট্টা ফিরাইয়া লইবার অর্থে হকুম লিখিতে পারিবার কথা।

২৪ ধারা।

মদিরা জন্মাইবার ও বেচিবার স্থাননিরূপণের মতের কথা।

উপরের লিখিত পাট্টা নির্ণয়ের প্রণালীর অনুসারে মদিরা জন্মাইবার ও বেচিবার স্থানসকলের নিরূপণ করিতে হইবেক এবং সে সকল স্থান ও শুঁড়ীরা পোলীসের আমলাদিগের সম্ভোষ্য ও আজ্ঞাবহ হইবার নিমিত্তে সে নিরূপণের ফেরফার সর্ব্বদা করিবার শক্তি মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের থাকিবেক ইতি।

২৫ ধারা।

কোন শহরে ও কস্বাদিগরে ভাটী না রাখা যাইবার কথা।

জানা গেল যে কোন শহরের ভিতরে কিম্বা কোন কস্বার অথবা গ্রামের মধ্যে সমূহ লোকালয় সমীপে ভাটী করিলে নিতান্ত অসুখ জন্মে কারণ এই যে ভাটীতে স্থান অতিঅপরিষ্কার ও ইমলৎ হয় ও তথাকার বিট্কাল ক্লেদরাশিঘটিত বাতাসে লোকেরা পীড়া পায়। অতএব চারি শহরের মধ্যে অর্থাৎ জাহাঁগীরনগরে ও মুরশিদাবাদে ও আজীমাবাদে ও বারাণসে কিম্বা কোন কস্বার অথবা গ্রামের মধ্যে বহুবসতীর সমীপে ভাটী করিবার অর্থে পাট্টা দেওয়া যাইবেক না। এবং এ ধারাক্রমে হকুম হইতেছে যে ঐ সকল শহরপ্রভৃতির মধ্যে কোন স্থানে কেহ ভাটী করিতে লাগিলে তাহতে মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা প্রতিবাদী হইবেন এবং এমতে কখন

ইহার

Copy of the original Bengalee document above alluded to.

শ্রীশ্রীপরমেশ্বরো জয়তি।

এতদ্দেশি বিষয়ি লোকেরা স্বকীয় ভাষার শুদ্ধরূপে লিখনে ও শব্দার্থবোধে ও নানা দেশীয় বিবরণ জ্ঞানে প্রায় অনেকে অপটু ছিলেন। তাহার কারণ এই যে সংস্কৃতে অসংস্কৃত লোকের দিগের শুদ্ধ লিখন ও শব্দার্থবোধ দুর্ঘট এবং বালক কালা-বধি স্বং শিক্ষকের নিকট শুদ্ধ লিখন পঠনাদি হইলেও তৎসংস্কার বশতঃ লোকেরা শুদ্ধ লিখনাদি ক্ষম হইতে পা-রেন পূর্ব্বে তাহাও অত্যল্প ছিল এবং বঙ্গ ভাষাতে দেশ বি-ভাগ বিবরণার্থে কোন পুস্তক ও রচিত ছিল না সুতরাং এত-দ্দেশীয়েরা শুদ্ধ লিখন ও শব্দার্থবোধ ও অন্য দেশবৃত্তান্ত জ্ঞানে অপটু প্রায় এবং জন্মান্ধ সদৃশ হইয়া অর্থকরী কিঞ্চিদ্বিদ্যোপার্জ্জন দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া কাল ক্ষেপ করিতেন।

এবং এতদ্দেশীয় পণ্ডিত কতৃক শুদ্ধীকৃত মুদ্রিত পুস্তক ও প্রচলিত ছিল না যে তত্তমুদ্রিত পুস্তক বর্ণানুসারে তাঁহারা শুদ্ধ লিখনাদিতে ক্ষমাতাপন্ন হয়েন। পরে শ্রীযুক্ত ইংল-ণ্ডীয় লোকেরা মুদ্রিত পুস্তকের প্রচার করিলে ও এত-দ্দেশীয়েরা তৎপথপ্রবৃত্ত হইয়া কামসংবর্দ্ধক নানাবিধ রতিমঞ্জরী বিদ্যাসুন্দর কামশাস্ত্র প্রচার করিয়া বালকের-

দিগ্দর্শন।—

প্রথম ভাগ।—

আমিরিকার দর্শন বিষয়।—

পৃথিবী চারি ভাগে বিভক্ত আছে ইওরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা। ইওরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা এই তিন ভাগ এক মহাদ্বীপে আছে ইহারা কোন সমুদ্রদ্বারা বিভক্ত নয় কিন্তু আমেরিকা পৃথক্ এক দ্বীপে প্রথম দ্বীপহইতে সে দুই হাজার ক্রোশ অন্তর। অনুমান হয় তিন শত চাল্লিশ বৎসর হইল আট শত আটানব্বই শালে আমেরিকা প্রথম জানা গেল তাহার পূর্ব্বে আমেরিকা কোন লোককর্ত্তৃক জানা ছিল না এই নিমিত্তে তাহার প্রথম দর্শনের বিবরণ লিখি।—

যেহেতুক পৃথিবীর মধ্যে যেং কর্ম্ম হইয়াছে সেং কর্ম্মহইতে এ কর্ম্ম বড়। অনুমান পাঁচ শত বৎসর গত হইল চুম্বক পাথরের গুণ প্রথম জানা গেল তাহার গুণ এই যে তাহাকে কোন লোহে ঘষিলে সে লোহ সর্ব্বদা দুই কেন্দ্রে অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে থাকে সেই লোহ কোম্পাসের মধ্যে দিলে সমুদ্রে কিম্বা মৃত্তিকার উপরে যে কোন স্থানে কোন লোক থাকে সেই কোম্পাসের দ্বারা পৃথিবীর সকল ভাগ সে জানিতে পারে। কোম্পাসের গঠন এই মত এক কাগজের উপরে মণ্ডলাকৃতি করিয়া বত্রিশ সমানাংশ করিয়া চতুর্দিকে সকল দিগ ও বিদিগ্ ও উপদিগ্

ক না

সমাচার দর্পণ।

১ সংখ্যা] শনিবার। ২৩ মে সন ১৮১৮। ১০ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৫। ( )

সমাচার দর্পণ।

কএক মাস হইল শ্রীরামপুরের ছাপাখানাহইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাসং ছাপাইবার কল্পও ছিল তাহার অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিকটে সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে সকলের সম্মতি হইল না এই প্রযুক্ত যদি সে পুস্তক মাসং ছাপা যাইত তবে কাহারো উপকার হইত না অতএব তাহার পরিবর্ত্তে এই সমাচারের পত্র ছাপাইতে আরম্ভ করা গিয়াছে। ইহার নাম সমাচার দর্পণ।—

এই সমাচারের পত্র প্রতিসপ্তাহে ছাপান যাইবে তাহার মধ্যে এইং সমাচার দেওয়া যাইবে।

১ এতদ্দেশের জজ ও কালেক্টর সাহেবেরদের ও অন্য রাজকর্ম্মাধিকারেরদের নিয়োগ।—

২ শ্রীশ্রী যুত বড় সাহেব যেং নূতন আয়িন ও হুকুম প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন।

৩ইংলণ্ড ও ইওরোপের অন্যং প্রদেশহইতে যেং নূতন সমাচার আইসে এবং এই দেশের নানা সমাচার।

৪ বাণিজ্যাদির নূতন বিবরণ।

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া।

৬ ইওরোপ দেশীয় লোককর্ত্তৃক যেং নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তকহইতে ছাপান যাইবে এবং যেং নূতন পুস্তক মাসেং ইংগ্লণ্ডহইতে আইসে সেই সকল পুস্তকে যেং নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির বিবরণ থাকে তাহাও ছাপান যাইবে।

৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ।

এই সমাচারের পত্র প্রতি শনিবারে প্রাতঃকালে সর্ব্বত্র দেওয়া যাইবে তাহার মূল্য প্রতি মাসে দেড় টাকা। প্রথম দুই সপ্তাহের সমাচারের পত্র বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে। ইহাতে যে লোকের বাসনা হইবেক তিনি আপন নাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে প্রতি সপ্তাহে তাহার নিকটে পাঠান যাইবে।

মসলা বিক্রয়ের ইস্তাহার।

সমাচার দেওয়া যাইতেছে ৮ জুন সোমবার সাড়ে দশ ঘড়ীর সময় কোম্পানির পুরাণা কুঠীর মধ্যে খাতাবাটীতে মোকাম বান্দা আমদানী মসলা জাহাজ সুরবয়া ও যেনড্রেন আইসে তাহা নিলাম বিক্রয় হইবেক নীচে দফাওয়ারী লিখিত মতে জানিবা।

বান্দা আয়ফল প্রথম রকম	৭৫০০ পোন
ঐ দোসরা রকম	৭৫০০
ঐ — সীরস	২০০১
এম্বোয়ানা জায়ফল	
খোসাসমেত	৮০
বান্দা জৈত্রী প্রথম রকম	১০০০০
ঐ সীরস	২০৭
এম্বোয়ানা সীরস	১৪১

২ দফা এক টাকা ফিলাট বায়না ও আমানত ফি শত ১০ দশ টাকার উপর দিতে হইবেক নিলামের সময় মাতবরির কারণ তাহাতে কোন কসুরি করে তবে ঐ লাট পুনরায় বিক্রয় হইবেক ক্রয় করিতে কোন নোকসান হয় তাহা প্রথম খরিদারকে দিতে হইবেক মুনাফা হইলে কোম্পানির হইবেক।—

৩ তিন দফা ইস্তক নিলামের তারিখ লাগাইদ এক মাসের মধ্যে মসলা খরিদের বেবাক টাকা দিয়া মাল খালাস করিয়া লইয়া যাইবেক যদি এই মাফিক না করে তবে ঐ আমানত এবং বায়নার টাকা কোম্পানিতে জমা হইবেক এবং মসালা নগদ টাকায় পুনরায় বিক্রয় হইবেক বিক্রয় করিতে যে নোকসান হইবেক এবং খাস্তে

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ভ্রাতর্ব্বোধসরোজ কিংচিররসে মৌনস্য নায়ংক্ষণো দোষধ্বান্ত দিগন্তরং ব্রজ নতে হবস্থান মত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সংকৃত্যমত্যাদরা দ্দৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।।

৩৬ সংখ্যা। ৭ বালম ইং ১৮৩৯ সাল ৭ এপ্রেল রবিবার ... ১২২২ সাল ২৬ চৈত্র ...

সাপ্তাহিক

১ খণ্ড। } ১ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১২৭৪ সাল। ২০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ। } ১ সংখ্যা।

॥ সতাংমনস্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈবসর্ব্বেষুসমপ্রভাকরঃ ॥
॥ উদেতিভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসম্বাদনবপ্রভাকরঃ ॥

সর্ব্বশুভকরীপত্রিকা

অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেবাতিরিচ্যতে

প্রথম ভাগ।] আশ্বিন। শকাব্দাঃ ১৭৭২। [২ সংখ্যা।

শ্রী

॥ তোতা ইতিহাস ॥

॥ বাঙ্গালা ভাষাতে ॥

॥ শ্রীচণ্ডীচরণ মুন্শীতে রচিত ॥

লন্দন রাজধানিতে চাপা হইল

১৮২৫

কহিলেক যে এক্ষণে গাত্রোৎথান করিয়া যে তোমার মন হরণ করিয়াছেন তাহার নিকট যাও। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা গমন করিতেছিলেন এই কালে কুক্কুট রব করিলেক এবং প্রাতঃকাল হইল এজন্যে সে দিবসও খোজেস্তার যাওন রহিত হইল ॥

॥ দশম ইতিহাস ॥

এক সয়দাগরের কন্যা আর এক শৃগালের কথা ॥

যখন সূর্য্যাস্তে রাত্রি হইল তখন খোজেস্তা কন্দর্পেতে অতি পীড়িতা হইয়া তোতার নিকটে বিদায় হইতে গমন করিয়া কহিলেন যে আমি তোমাকে বড় সুবোধ জানিয়া প্রতি রাত্রেই তোমার সমীপে আসিতেছি তাহাতে যদি তুমি আমাকে উত্তম পরামর্শ না দিবা তবে আর কি দিবে এবং তুমি আমার সহকারিতা না করিলে আর কে করিবে। তোতা উত্তর করিলেক যে ও কর্ত্রী আমি তোমার এই বিষয়ের জন্যে এমত দুঃখী আছি তাহা কি কহিব যদি এ কার্য্য না হয় তবে যত দিন আমার প্রাণ থাকিবেক তত দিবস কদাচিত আমার চিত্তের দুঃখ যাইবে না অত এব নিত্য রাত্রিতে তোমাকে তোমার বন্ধুর স্থানে যাইতে কহি কিন্তু তুমি বিলম্ব কর আর আমার উপন্যাস শুনিয়া যাও না যদি

শ্রীযুত রাজাবিক্রম সেনের রাজসভা

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যা-

দি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

ব্যাপ্টিস্ট-মিশন-যন্ত্রে মুদ্রিত।

কলিকাতা।

শকাব্দা ১৭৭৪।

ইং

১৮৫১

সালের পঞ্জিকা।

বাং ১২৫৭।৫৮ সন।

ইংলণ্ডের মহারাণী, শ্রীল শ্রীমতী বিক্টোরিয়া।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল, লর্ড ড্যাল্-

হৌসি। বঙ্গদেশের গবর্ণর,

সর যন হণ্টর লিটলর।

এই

গোলেবকাওলি।

অর্থাৎ

পারস্য বকাঅলি গ্রন্থ বঙ্গভাষা
য় পয়ারাদি নানা ছন্দে শ্রীযুক্ত
উমাচরণ মিত্র তথা শ্রীযুক্তপ্রাণ
কৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক বিরচিত হই
য়া ইদানীং শ্রীযুক্তচন্দ্র কর্ম্মকা
রের অনুমত্যনুসারে

শ্রীরামপুর।

চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সন ১২৫৫ সাল।

ইং ১৮৪৮ সাল।

৭৬

দ্বিতীয়বার ছাপা।

বাল্মীকিকৃত

রামায়ন

মহা কাব্য।

কীর্ত্তিবাস বাঙ্গালি ভাষায় রচিল।

প্রথম কাণ্ড।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

১৮০৩।

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

১ খণ্ড] শকাব্দা ১৭৭৬, পৌষ। [৫ সংখ্যা।

ভীল জাতির বিবরণ।

এতৎ পত্রের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশানন্তর আমরা কোন বন্ধু প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইয়াছি যে কোন২ বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহানুরাগিণী ধীমতীরা রাজপুত-ইতিহাস-প্রবন্ধে ব্যবহৃত ভীল শব্দে কোন্ জাতিকে কহে? তাহাদের আবাস স্থান কোথায়? তাহারা কোন্ ধর্মাবলম্বী? ইত্যাদি বিষয়ক ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন। এই অনুরোধ বশতঃ আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক এই সংক্ষেপ প্রস্তাব চিত্র সম্বলিত প্রকাশ করিলাম।

শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ-সঙ্কর/জাত এই ভারতবর্ষের নানা স্থানে বেদ-শাস্ত্র-বিমুখ নানা অসভ্য জাতি-সকল বহুকালাবধি বর্ত্তমান আছে; এবং ইহাদের অনেকের নাম পুরাবৃত্তিতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতন্মধ্যের প্রায়

সেকালের কথা।

পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যে সকল জন্তু লোপ পাইয়াছে, আর হয়ত তাহারা কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই।

জন্তু আবার লোপ পায়?

হাঁ পায়। বর্ত্তমান সময়ে বলিতে গেলে আমাদের চক্ষের সামনেই কতকগুলি জন্তু লোপ পাইয়াছে। নিউজীলণ্ড দ্বীপে "মোয়া" নামক এক প্রকার অতি বৃহৎ পক্ষী ছিল।

ডোডো।

মোয়া।

প্রাচীন ভ্রমণকারীদের কেহ কেহ এই পক্ষী দেখিয়াছেন, এমন কথাও শুনা যায়। কিন্তু এখন আর সে পাখী নাই। মোয়ার ডিম এবং কঙ্কাল এখনও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, কিন্তু জীবিত মোয়া আর দেখা যায় না। মাদাগাস্কার দ্বীপে "ডোডো" নামক আর এক প্রকার পাখী ছিল। এই পাখী পায়রার জাতীয়। সে উড়িতে জানিত না। খাইতে খুব ভাল ছিল। কোন কোন সাহেব এই পাখী খাইয়া তাহার মাংসের প্রশংসা বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। যাহা খাইতে এত ভাল লাগে, তাহাকে যদি এত সহজে

বন্দুকের কুঁদা ব্যাঘ্রের গলার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। ব্যাঘ্র তখন নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া বন্দুকের কুঁদা গলা-হইতে বাহির করিবার জন্যে যত পশ্চাতে আসিতে আরম্ভ করিল, সিপাহীও তত অগ্রসর হইয়া বন্দুক ঠেলিতে লাগিল। পরিশেষে ব্যাঘ্র সাতিশয় কাতর হইয়া ভূতলে পড়িল; সিপাহী তৎক্ষণাৎ সঙ্গিন দিয়া ব্যাঘ্রের উদর বিদ্ধ করাতে সে মৃত প্রায় হইয়া পড়িয়া রহিল। পরে অনেক লোক একত্র হইয়া লগুড়াঘাতে ব্যাঘ্রের প্রাণ বধ করিল।
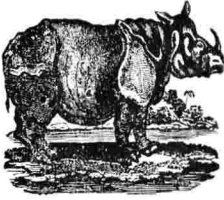
গণ্ডার।

উষ্ণপ্রধান দেশে গণ্ডার জন্মে। ইহাদিগের আকার বৃহৎ ও স্থূল। ইহারা স্বভাবতঃ অলস। যখন গমন করে তখন আস্তে আস্তে যায়। ইহাদিগকে আঘাত না করিলে কাহাকেও কিছু বলে না। কোন কোন গণ্ডারের এক খড়্গ কাহারও বা দুই খড়্গ হয়।
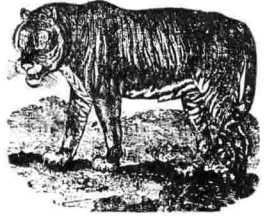
ব্যাঘ্র।

ব্যাঘ্রের আকারাদি।

ব্যাঘ্র প্রায় আশিয়াতেই জন্মে। হিন্দুস্থানে ও তাহার নিকটবর্ত্তি উপদ্বীপে অনেক ব্যাঘ্র আছে, চীন ও তাতার দেশের উত্তর সীমাতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্যাঘ্র সিংহ অপেক্ষা আকারে কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র। ইহার তুল্য হিংস্র জন্তু আর নাই। যাবতীয় চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে ব্যাঘ্র দেখিতে অতি সুন্দর। ইহার বর্ণ ধূসর, মুখের পেটের ও গলদেশের বর্ণ ঈষৎ শুক্ল। ব্যাঘ্রের চর্ম্ম চিক্কণ, কোমল, ও অনেক রেখায় অঙ্কিত, এজন্যে কোন কোন দেশে অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়, এবং অনেক কর্ম্মে লাগে। চীন দেশের বিচারকর্ত্তারা ব্যাঘ্রের চর্ম্মদ্বারা বসিবার গদি ও বালিশ প্রস্তুত ও আসন আচ্ছাদিত করেন। সে দেশে উহার মূল্য অধিক।

সাপ রাজপুত্র।

দত্ত প্রেস
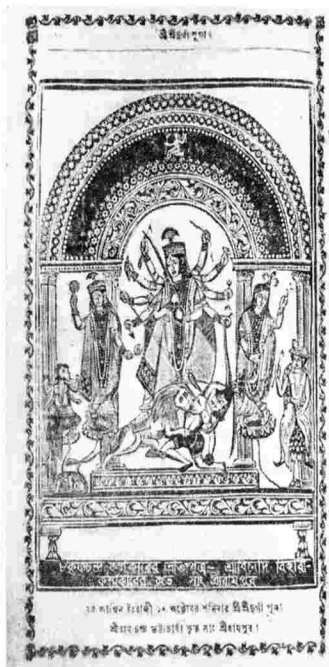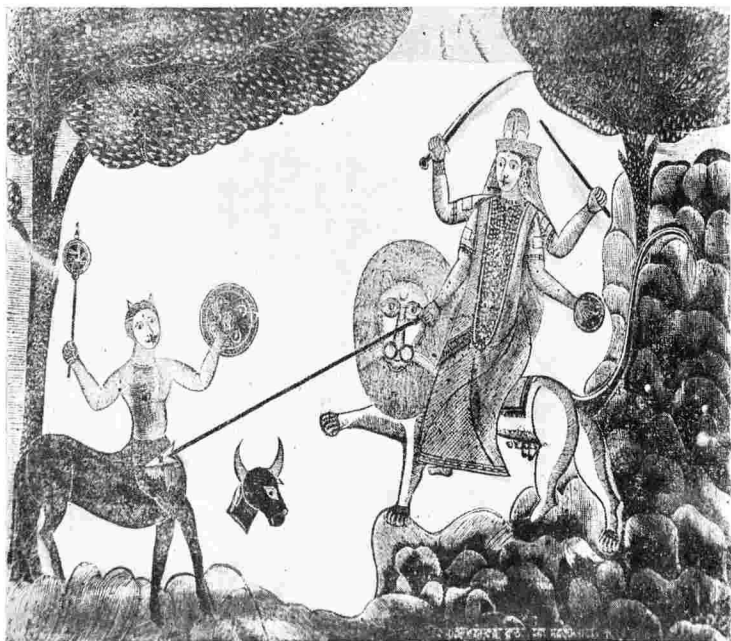
চিত্রসূচী

চিত্রপৃষ্ঠাংক—১ উপরে—ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে ইউরোপে ব্যবহৃত কাঠের ছাপাখানা।

নিচে—উনিশ শতকের কলকাতায় প্রচলিত লৌহ-যন্ত্র। এ-ধরনের ছাপাখানা কিন্তু এখনও কিছু কিছু চালু রয়েছে কলকাতায়।

" —২ উপরে—পঞ্চানন কর্মকারের জামাতা মনোহরের তৈরি বাংলা হরফের পাঞ্চ। এই সব স্মৃতিচিহ্ন কিছুকাল আগেও কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে রক্ষিত ছিল।

নিচে—আদ্যিকালের হরফ তৈরির সাজসরঞ্জাম। শ্রীরামপুরের একটি হরফ তৈরির কারখানায় এখনও রয়েছে এইসব আদিম যন্ত্রপাতি।

" —৩ উপরে—১৬৬৭ সনে "চায়না ইলাস্ট্রেটা"-য় প্রকাশিত বাংলা লিপির নমুনা। চলনশীল বাংলা হরফ তখনও দূরবর্তী সম্ভাবনা-মাত্র।

নিচে—১৭৪৩ সনে হল্যান্ড থেকে প্রকাশিত ডেভিড মিল-এর বইয়ে পরিবেশিত বাংলা লিপির নমুনা। এ-হরফও প্লেটে খোদাই করা।

" —৪ —হলহেড-এর "এ কোড অব জেণ্টু লজ" বইয়ে মুদ্রিত বাংলা লিপি। প্রকাশকাল—১৭৭৬ সন। দু'বছর পরে এই হলহেড সাহেবের ব্যাকরণেই প্রথম ব্যবহৃত হয় চলনশীল বাংলা হরফ।

" —৫ —গ্ল্যাডউইন-এর "আইন-ই-আকবরী"-র পরিশিষ্টে মুদ্রিত বাংলা লিপির নমুনা। প্রকাশ-কাল—১৭৭৭ সন। এটিও প্লেট-যোগে ছাপা।

চিত্রপৃষ্ঠাঙ্ক—৬ উপরে—১৭৯৯ সনে প্রকাশিত এডমণ্ড ফ্রাই-এর "পেন্টোগ্রাফিয়া" থেকে। চলনশীল বাংলা হরফের ব্যবহার তার আগেই শুরু হয়ে গেছে। রয়াল সোসাইটির জন্য ফ্রাই বাংলা হরফের এ-নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন একটি ফরাসী এনসাইক্লোপেডিয়া থেকে।

নিচে—১৮২৪ সনে জন জনসন-এর "টাইপোগ্রাফিয়া"-য় প্রকাশিত বাংলা বর্ণমালা। এ-নমুনা জনসনকে সরবরাহ করেছিলেন সার চার্লস উইলকিন্স স্বয়ং। হলহেড-এর ব্যাকরণের বাংলা হরফের সঙ্গে এ-লিপির সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

" —৭ —হলহেড-এর ব্যাকরণের নামপত্র। প্রকাশকাল—১৭৭৮। প্রকাশ স্থান—হুগলি। এই বইটিতেই প্রথম ব্যবহৃত হয় চলনশীল বাংলা হরফ। সেদিক থেকে বলতে গেলে এটিই প্রথম মুদ্রিত বাংলা বই।

" —৮ —হলহেড-এর ব্যাকরণ-এর একটি পৃষ্ঠা। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ হলেও বইটি ইংরাজীতে লেখা। উদাহরণ হিসাবে লেখক ব্যবহার করেছেন বাংলা শব্দ, বাক্য, এবং বাংলা কাব্য থেকে উদ্ধৃতি।

" —৯ —হলহেড-এর ব্যাকরণের আরও একটি পৃষ্ঠা। বাংলা-মুলুকে প্রথম মুদ্রিত বই হলেও এর প্রতিটি পৃষ্ঠা এখনও দেখবার মতো।

" —১০ —হলহেড-এর বাংলা ব্যাকরণে পরিবেশিত সমসাময়িক বাংলা হস্তলিপির নমুনা। প্লেট-যোগে ছাপা।

" —১১ —হস্তলিপির রূপান্তর ঘটানো হয়েছে আর একটি প্লেটে। এখানে লিপি অনেক সহজ-বোধ্য।

" —১২ —হলহেড-এর ব্যাকরণের শেষে যুক্ত শুদ্ধিপত্র। এটি যোগ করা হয়েছিল বইটি বিলাতে

চিত্রপৃষ্ঠাঙ্ক

পৌঁছাবার পর। হরফ এখানে স্পষ্টতই অন্যরকম। প্লেট-যোগে ছাপা।

” —১৩ —জনাথন ডানকান অনূদিত “রেগুলেশনস্ ফর দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব দি জাস্টিস ইন দি কোর্ট অব দেওয়ানী আদালত” গ্রন্থের নামপত্র। এটি ছাপা হয়েছিল কলকাতায়, “অ্যাট দি অনারেবল কোম্পানি প্রেস”। মুদ্রণকাল—১৭৮৫ সন।

” —১৪ —ডানকান কর্তৃক অনূদিত বইটির একটি পৃষ্ঠা।

” —১৫ —এইচ. পি. ফরস্টার অনূদিত বিখ্যাত “কর্নওয়ালিশ কোড”-এর একটি পৃষ্ঠা। যে বই থেকে সংগৃহীত সেটি নামপত্রহীন। ডানকান-এর বইয়ে ব্যবহৃত হরফের সঙ্গে এর হরফের মিল এবং অমিল দুই-ই লক্ষণীয়। কলকাতায় মুদ্রিত। মুদ্রণকাল ১৭৯৩ সন।

” —১৬ —“কর্নওয়ালিশ কোড”-এর আর একটি পৃষ্ঠা। নিচে অনুবাদ শেষে ফরস্টার-এর নামাঙ্কিত। সুতরাং, নামপত্রহীন হলেও বইটিকে “কর্নওয়ালিশ কোড” বলে ধরে নিতে অসুবিধা নেই।

” —১৭ —এ. আপজন-এর “ইঙ্গরাজি বাঙ্গালি বোকেবিলারি”র একটি পৃষ্ঠা। মুদ্রাকর—দি ক্রনিকল প্রেস, কলকাতা। প্রকাশকাল—১৭৯৩ সন। সে-বছরই প্রকাশিত “কর্নওয়ালিশ কোড”-এর হরফের সঙ্গে এ-বইয়ে ব্যবহৃত বাংলা হরফের পার্থক্য লক্ষণীয়।

” —১৮ ১৭৯৭ সনে প্রকাশিত জন মিলার-এর “সিক্ষ্যাগুরু” “কিম্বা এক নৈতন ইংরাজি আর বাঙ্গালা বহি”র একটি পৃষ্ঠা। বইটি কোথায় ছাপা হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক আছে। মনে হয়—মুদ্রণস্থল কলকাতা।

” —১৯ —ফরস্টার-এর বিখ্যাত “ভোকাবুলারি”র নামপত্র। বইটি ছেপেছিলেন তৎকালের কলকাতার

চিত্রপৃষ্ঠাঙ্ক বিখ্যাত মুদ্রাকর ফেরিস অ্যান্ড কোং। বইটি দুই খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল—১৭৯৯ সনে। দ্বিতীয় খণ্ড—১৮০১ সনে।

" —২০ —ফরস্টার-এর "ভোকাবুলারি"র একটি পৃষ্ঠা।

" —২১ —ইংরাজী সংবাদপত্র "ক্যালকাটা গেজেট"-এ প্রকাশিত বাংলা বিজ্ঞপ্তির নমুনা। এই বিশেষ নমুনাটি গৃহীত ১৭৮৫ সনের একটি কাগজ থেকে।

" —২২ —১৭৮৮ সনে প্রকাশিত "এশিয়াটিক রিসার্চেস"-এ (১ম খণ্ড) মুদ্রিত বাংলা হরফের নমুনা। এগুলো ব্যবহৃত হয়েছিল উইলিয়াম জোন্স-এর একটি প্রবন্ধে। ভাষা সংস্কৃত হলেও হরফ বাংলা। মুদ্রাকর—কোম্পানির ছাপাখানা।

" —২৩ —শ্রীরামপুরে ছাপা বাংলা মহাভারতের নামপত্র। মুদ্রণকাল—১৮০১ সন। কাশীরাম দাসের মহাভারত এই প্রথম ছাপা হল।

" —২৪ উপরে—শ্রীরামপুরে মুদ্রিত কাশীদাসী মহাভারতের দুটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি।

নিচে—১৮০৩ সনে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত কৃত্তিবাসের রামায়ণের দু'টি পৃষ্ঠা।

" —২৫ —রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং"-এর প্রথম পৃষ্ঠা। এটিও শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসে ছাপা। প্রকাশকাল—১৮০৫ সন।

" —২৬ —১৮৩৩ সনে শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসে মুদ্রিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "প্রবোধ চন্দ্রিকা"র একটি পৃষ্ঠা।

" —২৭ —১৮২৮ সনে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত "আইন"-এর নামপত্র। এই বইটিতে ১৭৯৬ থেকে শুরু করে ১৮০১ সনের মধ্যে প্রচলিত নানা আইনের

চিত্রপৃষ্ঠাঙ্ক — বাংলা অনুবাদ রয়েছে। এটি দ্বিতীয় সংস্করণের বই।

” —২৮ —১৮২৮ সনে প্রকাশিত “আইন”-এর একটি পৃষ্ঠা। দর্শনীয় হরফ। মনে হয় এই হরফই বুঝি পরবর্তীকালে লাইনো হরফে রূপান্তরিত। এই অনুবাদের নিচেও কিন্তু রয়েছে এইচ. পি. ফরস্টার-এর নাম। তবে কি “কর্নওয়ালিশ কোড”-এর মতো এর অনুবাদকও তিনিই?

” —২৯ —কলকাতার স্কুল বুক সোসাইটির তৃতীয় বর্ষের (১৮১৯—২০) বিবরণ থেকে একটি বিশেষ পৃষ্ঠা। বাংলা হরফের ছাঁদ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শেষ বাক্যে তিনটি শব্দের হরফ অন্য-রকম,—উদ্ধৃতি-চিহ্ন বা হেলানো-হরফের বদলে সহজে পড়ুয়ার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিকল্প সন্ধানের চেষ্টা। সোসাইটির অনুরোধে এ-হরফ উদ্ভাবন করেছিলেন ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের মিঃ পিয়ার্স। নমুনাটি সংগ্রহ করা হয়েছে ১৮২০—২১ সনে প্রকাশিত তৃতীয় প্রতিবেদন থেকে।

” —৩০ —শ্রীরামপুরের মিশনারীদের প্রকাশিত মাসিক “দিগ্‌দর্শন”-এর প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। প্রকাশকাল—এপ্রিল, ১৮১৮ সন।

” —৩১ —শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদ-পত্র “সমাচার দর্পণ”-এর প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠা। প্রকাশকাল—মে, ১৮১৮ সন।

” —৩২ —সংবাদপত্র সাময়িকপত্রের শীর্ষনাম হিসাবে ব্যবহৃত বাংলা হরফের কিছু নমুনা। এগুলো ছাপা হয় ব্লকযোগে। সাধারণত কাঠে খোদাই-করা ব্লকে।

” —৩৩ —১৮২৫ সনে “লন্দন রাজধানিতে চাপা” মুনশী চণ্ডীচরণের “তোতা ইতিহাস”-এর নামপত্র।

” —৩৪ —লণ্ডনে ছাপা “তোতা ইতিহাস” থেকে একটি পৃষ্ঠা। বইটির মুদ্রাকর—কক্স অ্যাণ্ড বেইলিস।

চিত্রপৃষ্ঠাংক—৩৫

উপরে—লণ্ডনের হরফ নির্মাতা ভি. অ্যাণ্ড জে ফিগিনস পরিবেশিত বাংলা পাইকা হরফের নমুনা।

নিচে—১৮৩৩ সনে লণ্ডনে প্রকাশিত হটন-এর বিখ্যাত অভিধানের একটি পৃষ্ঠার অংশ। এই বিশাল বইটির মুদ্রাকর ছিলেন—জে. এল. কক্স অ্যাণ্ড সন।

” —৩৬

উপরে—১৮১৬ সনে প্রকাশিত প্রথম সচিত্র বাংলা বই "অন্নদামংগল"-এ প্রকাশিত একটি চিত্র। ছবিটি এঁকেছিলেন শিল্পী রামচাঁদ রায়। বিষয়—বকুলতলায় সুন্দর।

নিচে—"অন্নদামংগল"-এর আরও একটি দৃশ্য, সুন্দরের বর্ধমান প্রবেশ। শিল্পী—রামচাঁদ রায়। বইটির প্রকাশক ছিলেন স্বনামধন্য গংগাকিশোর ভট্টাচার্য। মুদ্রাকর—ফেরিস অ্যাণ্ড কোং। প্রকাশকাল—১৮১৬ সন।

” —৩৭

উপরে—১৮২৪ সনে প্রকাশিত "গৌরীবিলাস" গ্রন্থের একটি অলংকরণ।

নিচে—১৮২৫ সনে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের আর একটি অলংকরণ। শিল্পী—মাধবচন্দ্র দাস। চিত্রের বিষয়—রাজা বিক্রম সেনের সভায় শাস্ত্রবিচার।

” —৩৮

উপরে—(বাঁ দিকে) শ্রীরামপুর থেকে ১৮০১ সনে প্রকাশিত বিতর্কিত "ধর্মপুস্তক"-এর নামপত্র। এই বইটির সংগে মিশন কর্তৃক প্রকাশিত "ধর্মপুস্তক"-এর কিছু গরমিল রয়েছে। তবে কি এর প্রকাশক অন্য কেউ?

উপরে—(ডান দিকে) ১৮০৭ সনে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত "মুগ্ধবোধ" ব্যাকরণের নামপত্র।

নিচে—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত বিখ্যাত "শ্রীমদ্ভাগবত"-এর দুটি পৃষ্ঠা।

বইটি ছাপা হয়েছিল নাকি বিশুদ্ধ হিন্দুমতে, "তুলাত কাগজে প্রাচীন ধারামত",—"চন্দ্রিকাযন্ত্রে ব্রাহ্মণদ্বারা।" প্রকাশকাল—১৮৩০ সন।

" —৩৯ —ঊনবিংশ শতাব্দীর নানা প্রহরে মুদ্রিত বাংলা বই ও সাময়িকপত্রের কয়েকটি সুদৃশ্য নামপত্র। পঞ্জিকাটি খ্রীস্টীয় পঞ্জিকা।

" —৪০ উপরে—রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত প্রথম সচিত্র বাংলা মাসিকপত্র "বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ"-এর একটি পৃষ্ঠা। সুদৃশ্য এবং সুমুদ্রিত এই সাময়িক পত্রটির মুদ্রাকর ছিলেন—কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস।

নিচে—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর "সেকালের কথা"র একটি পৃষ্ঠা। লেখক নিজেই বইটির চিত্রকর। ছবিগুলো হাফটোন-এ ছাপা। বইটির প্রথম প্রকাশ—১৯০৩ সনে।

" —৪১ উপরে—পাদ্রী জন লসন-এর আঁকা "পশ্বাবলী" (১৮১২—) থেকে দুটি চিত্র।

নিচে—(বাঁয়ে) পাদ্রী লঙ সাহেব সম্পাদিত "সত্যার্ণব" থেকে একটি অলঙ্করণ। শিল্পী সুখ্যাত রামধন স্বর্ণকার। (ডাইনে) বাংলা ১২৮৩ সনে প্রকাশিত "দেবী যুদ্ধ"-এর একটি অলংকরণ। শিল্পী—নৃত্যলাল দত্ত।

" —৪২ উপরে—পুরানো পঞ্জিকার দুটি ছবি। একটির চিত্রকর মনোহর-পুত্র প্রখ্যাত শিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার। অন্যটি কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকারের ভ্রাতুষ্পুত্র বিনোদবিহারী কর্মকার কৃত।

নিচে—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আঁকা "সন্দেশ"-এর একটি অলংকরণ। বিষয়—

সাপ-রাজকুমার। ছবিটি মুদ্রিত হয় "সন্দেশ"-এর দ্বিতীয় বর্ষে, ১৩২১ সনে। চিত্রকর নিজেই তখন ব্লকনির্মাতা। মুদ্রাকর—ইউ রায় অ্যান্ড সন্স।

" —৪৩ —বটতলার একটি রঙীন কাঠখোদাই। ব্লকে ছবি ছাপার পর এ-সব চিত্রে রঙ দেওয়া হত হাতে।

" —৪৪ উপরে—বটতলার আরও একটি রঙীন কাঠখোদাই। উনিশ শতকের শেষদিকে এসব চিত্র কালীঘাটের পটের মতোই রীতিমত জনপ্রিয় ছিল।

নিচে—এখনও কাঠখোদাই শিল্পীদল রয়েছেন জোড়াসাঁকো চিৎপুর অঞ্চলে। কাঠে হরফ এবং চিত্র দুই-ই খোদাই করেন তাঁরা। পুরানো দিনের ঐতিহ্য অতএব এখনও পুরোপুরি লুপ্ত নয়। কর্মরত শিল্পীর এই চিত্রটি অতি-সম্প্রতি গৃহীত। আলোকচিত্র—অমিয় তরফদার।